আমাদের ছুটি
২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
www.amaderchhuti.com
মাওয়ালি পাসের ছবি - সুদীপ বিশ্বাস

আমাদের ছুটি
ইচ্ছে হলেই...

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা - ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১৯

সত্যি বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকুইবা জানি... অন্য দেশ দূরে থাক, ভারতবর্ষেরও খুবই অল্প কয়েকটা জায়গাতেই আমি বেড়িয়েছি। ভ্রমণকাহিনি পড়তে বা বেড়ানোর ছবি দেখতে তাই বোধহয় এত ভালো লাগে। মনে মনেই ভুবনভ্রামণিক হই। ছেলেবেলায় পুজোর ঠিক আগে আগে এই সময়টায় মফস্বলের ছোট শহরটার আকাশ-বাতাস কেমন একটা মনকেমন করা গন্ধে ভরে উঠতো। প্রায়শঃ বিকেলে বেড়িয়ে একা একাই হাঁটতে হাঁটতে বাড়িঘরগুলো ছাড়িয়ে ধানক্ষেতের আল ধরে চলে যেতাম অনেকটা দূর... যেখানে দূরে টিলার মাথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কেমন একটা অপার্থিব অনুভূতিতে ভরে উঠত মনটা। একেকদিন চুপ করে বসে থাকতাম আলের ওপর। পাখিরা ডানা মেলে নীড়ে ফেরার সময় মনে করিয়ে দিয়ে যেত এবার আমাকেও ফিরতে হবে।

কোনদিন বিকেলবেলায় বারান্দায় বসে পড়তাম বিভূতিভূষণ কিংবা গীতবিতান। গানের ভিতর দিয়ে দেখতাম ভুবনখানি...। বড় প্রিয় ছিল রাণী চন্দের 'হিমাদ্রি' আর 'পূর্ণকুম্ভ'। পড়তে পড়তে কখন পৌঁছে গেছি হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটে, কেদারের পথে। অনেকদিন পরে আন্দামানের সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে কিংবা অরুণাচলের সবুজে ছাওয়া পথে যেতে যেতে হিমালয়ের মুখোমুখিতে এমন অনুভূতি বারবার হয়েছে। বিভূতিভূষণের একটা উপলব্ধি বড় বেশি সত্য মনে হয়েছে এইসময় – "আসলে দেখে চোখ আর মন। যখন ওই দুটি ইন্দ্রিয় বহুদিন বুভুক্ষু, তখন যে কোনো মুক্ত স্থান, সামান্য একটা বাঁশঝাড়, একটি হয়তো ধানের মরাইওয়ালা গৃহস্থবাড়ি, আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য নদী, কোথাও একটা বনের পাখীর ডাক – মধুর স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।"

www.amaderchhuti.com

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ালে তবেই বোধহয় দেখাটা সম্পূর্ণ হয়।

উৎসবের ছুটির দিনগুলোয় আপনারা অনেকেই হয়তো বেড়িয়ে পড়ছেন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ অনুভব করতে, আবার কেউবা ঘরের জানলা দিয়ে, বইয়ের পাতায়, ইন্টারনেটের অলিগলিতে খুঁজবেন ছুটির আকাশ। তাঁদের সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল ছুটির দিনগুলো ভালো কাটুক, আনন্দে কাটুক।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায়-

কথোপকথন

নানান দেশে নানান জায়গা...সেখানে আমরা একজন গেলাম, দেখলাম দুচোখ ভরে, তখন মনে হয় একটু ছড়িয়ে দিই... বন্ধুদের সাথে বেড়ানোর আনন্দ-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে মে মাসের এক সন্ধ্যায় কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে বসেছিল 'আমাদের ছুটি'-র আড্ডা। ***এবারে তারই এক ঝলক।***

□ আরশিনগর □

জঙ্গলে-জঙ্গলে সাইকেলে
– মহম্মদ শরীফুল ইসলাম

বকখালি ভ্রমণ ও একটি রচনা লেখার গল্প
– দময়ন্তী দাশগুপ্ত

কুয়াশাঘেরা হ্রদ-পাহাড়ের উপকথা
– বিপ্লব রহমান

□ সব পেয়েছির দেশ □

www.amaderchhuti.com

তবু অনন্ত জাগে ...হিমালয় ভ্রমণ – সেকাল একাল
- বিভাস দে

মাওয়ালি পাসের পথে
- সুদীপ বিশ্বাস

জগদলপুরের জলপ্রপাতে
- অদিতি ভট্টাচার্য

রূপকুণ্ডের রূপের রহস্যে
- দীপঙ্কর রায়

□ ভুবনডাঙা □

মালয়েশিয়ার দুই প্রান্তে
- রফিকুল ইসলাম সাগর

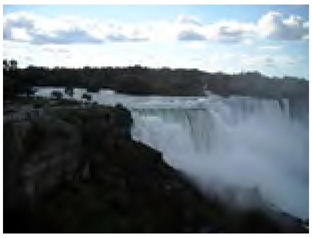

নৈসর্গিক নায়াগ্রা
- পায়েল চক্রবর্তী

□ শেষ পাতা □

ছোট্ট ছুটির পুরী - জয়ব্রত মুখার্জি

কলকাতার কাছেই -প্রত্যুষ সেনগুপ্ত

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কথোপকথন

"ছুটির পাখিটা ছটফট করে রোজ
খাঁচায় বন্দি পালাতে পারে না তাই
দানাপানি তাকে যতই দাও না তুমি
পাখির কিন্তু ছুটির আকাশ চাই।"

দৈনন্দিন জীবনের মাঝে সেই আকাশটা খুঁজে নিতে শনিবার,১২ মে, ২০১১ সন্ধ্যায় কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির জীবনানন্দ সভাঘরে 'আমাদের ছুটি'-র বন্ধুরা আড্ডায় বসেছিলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ও বিবিসি-র প্রবীণ সাংবাদিক ঊর্মি রহমান, কথাসাহিত্যিক মানব চক্রবর্তী, তথ্যচিত্র পরিচালক সৌমিত্র দস্তিদার। আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস এবং 'আমাদের ছুটি'-র বন্ধুরা। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত ।
সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়-সুরে অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিল ছোট্ট দুই ছুটি বন্ধু আকাশলীনা দাশগুপ্ত এবং তোর্সা চট্টোপাধ্যায়। স্লাইড প্রদর্শনীতে, ভদ্রকালী পদাতিকের সদস্য পর্বতারোহী সুব্রত দাস দেখান 'মণিরাং অভিযান'-এর আলোকচিত্র এবং খ্যাতনামা ট্রেকার ও আলোকচিত্রী রতনলাল বিশ্বাসের ক্যামেরায় উঠে এসেছিল কাশ্মীর থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 'হিমালয়ের হ্রদরাজি'। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুগত মুখোপাধ্যায়।
বন্ধুদের আগ্রহ ও উৎসাহে 'আমাদের ছুটি'-র প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকল। আর দূরের যে বন্ধুরা সেদিন যোগ দিতে পারেননি এই আড্ডায়, অথচ উৎসুক হয়ে ছিলেন, তাঁদেরও সেই আড্ডার শরিক করে নিতে এবারের এই কথোপকথন।

◆আমার সঙ্গে, আমার পাশে আজ এমন কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষ রয়েছেন যাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে 'ভ্রমণ' শব্দটা। বি.বি.সি.তে কাজের সূত্রে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরেছেন ঊর্মি রহমান। কলকাতার অলিগলি থেকে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম-অরণ্য, দাঙ্গার আগুনে জ্বলতে থাকা গুজরাট, উত্তপ্ত মণিপুর প্রত্যক্ষ করেছেন সৌমিত্র দস্তিদার। সমাজমনস্ক তথ্যচিত্রকার হিসেবেই সৌমিত্রদাকে আমরা জানি কিন্তু সৌমিত্রদা এমন অনেক কাজ করেছেন যেগুলো ভ্রমণের ক্ষেত্রে বড় মাপের জায়গা - বর্ধমান, মালদা, বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি, শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র মিউজিয়াম, সুন্দরবন নিয়ে তোলা তথ্যচিত্র। মানুষের কথা লেখার জন্য বার্ণপুরের ইস্পাত কারখানার চাকরি ছেড়ে বছরের পর বছর সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন মানব চক্রবর্তী। তাঁর কলমেই উঠে এসেছে অন্তেবাসী বৃহন্নলাদের জীবনকাহিনি। আবার অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাহাড়ে-সাগরে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। তবে শুধু মঞ্চের এই ক'জনই নন,আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় ট্রেকার-ফোটোগ্রাফার রতনদা - রতনলাল বিশ্বাস, পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস ও সুব্রত দাস, কথাসাহিত্যিক আলপনা ঘোষ, বোড়ো ভাষার অন্যতম লেখক-গবেষক হীরাচরণ নার্জিনারি এবং আপনারা সবাই - যাঁরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও এখানে এসেছেন আড্ডা জমাতে।

www.amaderchhuti.com

শ্রী রতনলাল বিশ্বাস | শ্রী মানব চক্রবর্তী | শ্রী সৌমিত্র দস্তিদার | শ্রীমতী ঊর্মি রহমান | শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস | শ্রী সুব্রত দাস

'আমাদের ছুটি'-র ১ম বর্ষপূর্ত্তি উৎসবের আরো ছবি

◆ সৌমিত্রদার সঙ্গে আড্ডাটা আসলে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে। ওঁর কাছেই ঊর্মিদি, আপনার 'এদেশে বিদেশে' বইটা দেখছিলাম। আমার যেটা মজার লেগেছে যে আপনি যেভাবে বইটা সাজিয়েছেন, বাংলাদেশের সুন্দরবন আর পশ্চিমবঙ্গের লাভা-লোলেগাঁওয়ের মাঝে রয়েছে গ্রীস, মঁ ব্লা, টেমসের কথা, রাইখেনবাখ ফলস, পম্পেই নগরী। এ যেন বাংলা থেকে বেড়িয়ে বিশ্ব ঘুরে আবার বাংলায় ফেরা।
ঊর্মিদি বইটা সাজানোর সময়ও কী এইকথাটাই মাথায় ছিল?
ঊর্মি - হয়ত সেভাবে ঠিক ভাবিনি। আসলে আমার শৈশব কেটেছিল সুন্দরবনে। বাবা ফরেস্টার ছিলেন, আমরা থাকতামই হাউসবোটে। বড় হয়েও যখন অনার্স পড়ছি তখন আবার সুন্দরবনে থেকেছি। অতদিন থাকতে থাকতে সুন্দরবনের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ভীষণরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মত। সেইজন্যই হয়তো সুন্দরবনটা প্রথমে এসেছে। আর যখন যেটা দেখেছি, লিখেছি, ইচ্ছা করেছে কারোর সঙ্গে শেয়ার করি। যেমন, একটা সুন্দর জিনিস দেখলে, ভালো একটা গান শুনলে, একটা ভালো কবিতা পড়লে আমাদের শেয়ার করার ইচ্ছা হয়...অন্য ভাষাভাষী মানুষদের কথা বলতে পারবনা তবে বাঙালির কিন্তু ভীষণ ইচ্ছা হয় অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করার...
◆আমাদের ছুটি-র ব্যাপারটাও কিন্তু তাই, সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নেওয়া।
ঊর্মি -আসলে প্রকৃতির মতো ওরকম সুন্দর তো আর কিছু হয়না। গোটা পৃথিবীটা ছড়িয়ে আছে...নানান দেশে নানান জায়গা...সেখানে আমরা একজন গেলাম, দেখলাম দুচোখ ভরে, তখন মনে হয় একটু ছড়িয়ে দিই। সেই ভাবনা থেকেই লেখাগুলো এসেছে।
◆ ঊর্মিদি, আপনার লেখায় পম্পেই নগরীর কথা রয়েছে...ছেলেবেলায় 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' খুব প্রিয় বই ছিল, কতবার যে পড়েছি...
সৌমিত্র - আমারও ভীষণ ফেভারিট ছিল...
ঊর্মি - একটা অ্যামেজিং জায়গা। ভিসুভিয়াসের লাভা এসে পুরো একটা জনপদ নিমেষে শেষ হয়ে গেল। লন্ডনে একটা টিকিট পাওয়া যায় ইন্টাররেল কার্ড - ১৬০ পাউন্ডের, সেটা কিনলে ইউরোপের উনিশটা দেশে ট্রেনে আনলিমিটেড সার্ভিস। আমরা ওভাবেই ইটালি গিয়েছিলাম... পম্পেইটা মনে হয়েছিল না দেখে আসা যাবেনা কিছুতেই।
◆সৌমিত্রদা, শুরুতে আপনার সম্বন্ধে যে কথাটা বলছিলাম রাজনৈতিক সত্তার বাইরে যে অন্য মানুষটা...আপনার অন্যরকম কাজ বা রাজনৈতিক তথ্যচিত্রগুলো তুলতে গিয়েও দেখা গেছে তার মধ্যেও প্রকৃতির অনুসঙ্গ চলে এসেছে বা কাজের ফাঁকে আপনি বেড়িয়েছেন...কিছুদিন আগেতো কাশ্মীরও ঘুরে এলেন...সেই বেড়ানোগুলোর কথা...আপনার অন্যরকম ভাবনাচিন্তার কথা...
সৌমিত্র - আসলে আমি জানিনা ঠিক এভাবে সাজিয়েগুছিয়ে মঞ্চে কতটা আড্ডা মারা যায়, তবে আমি আড্ডাবাজ মানুষ...
◆সেদিন আপনার বাড়িতে যে আড্ডাটা চলছিল তারই একটা এক্সটেনসন করে নিতে চাইছি...

সৌমিত্র - আজকে আমি অবশ্য একটু চাপে আছি...মানবদার মতো এরকম বিখ্যাত গল্পকার, লেখক, আর তার চেয়েও চাপে আছি যে ঘটনাচক্রে ঊর্মি রহমান শুধু যে বিখ্যাত তাই নন, আমার মামী শাশুড়িও বটে। শাশুড়িকে পাশে বসিয়ে কতটা আড্ডা মারা যাবে আমি জানিনা, মামাও বসে আছেন ওখানে।

মামীমা আসায় খুব ভালো লাগছে...তুমি যেখান থেকে শুরু করেছিলে, কালকে মামীমার বইটা পড়তে পড়তে একটা জায়গায় এসে...খুলনা থেকে বেরিয়ে একটা প্রায় নোম্যানস ল্যান্ডে এসেছে, ওপাশটা হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা, আমার নষ্টালজিয়া কাজ করল যে খুলনা আমার মামারবাড়ি, ওই সুন্দরবনটা আমার দেখা হয়নি, এই সুন্দরবনটায় আমি একাধিকবার গেছি। জানিনা মামীমা তুমি জানো কীনা, সুন্দরবনেই একটা দ্বীপ আছে, তার নাম রাখা হয়েছে খুলনা, আমি সেখানেও একাধিকবার গেছি। সমাজকর্মী তুষার কাঞ্জিলালের নামতো আপনারা জানেন। তুষারদা আর আমি পাশাপাশি থাকতাম। একদিন বললাম, তুষারদা আমি সুন্দরবন দেখতে যাব। উনি খুব রেগেটেগে বললেন তুই সুন্দরবন কী হিসেবে দেখতে যাবি, ট্যুরিস্ট হিসেবে? বললাম, ওই লোকে যেমন যায় লঞ্চটঞ্চ ভাড়া করে...উনি বললেন, তুমি একদম ওভাবে যাবেনা, যদি যেতে চাও গরমের দিন, যখন কালবৈশাখী হয়টয়...যথেষ্ট বিপদের একটা ভয় ভয় ব্যাপার থাকে...তবে অবশ্য এখানে দেবাশিস বিশ্বাস বা আরো যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে অবশ্য বিপদটিপদ বলে একটু অস্বস্তিই করছে। যাইহোক, তুষারদাতো প্রায় ধাক্কা মেরে বললেন, তুই চলে যা...ঘটনাচক্রে সেই প্রথম কাছ থেকে সুন্দরবন দেখা। তারপরতো অনেকবার গেছি। মামীমার লেখা পড়তে পড়তে সেসব মনে পড়ছিল। আরও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, জানিনা মামীমাকে বলেছি কিনা, যেহেতু মামারবাড়ি খুলনা, আমি যখন প্রথম খুলনায় যাই, তখন কয়েকজন লেখক বললেন যে, এখন কারফিউ চলছে, এককাজ কর, আমরা গভীররাত্রে তোমায় খুলনা দেখাতে নিয়ে যাব। আমিতো রাত আড়াইটে-তিনটের সময় খুলনায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম, আর যেখানে যেখানে আমার সঙ্গী তিনজন আমায় নিয়ে যাচ্ছে...বলছে এটা কবরখানা...আমি বলছি হ্যাঁ, এটা সাহেবের কবরখানা, বলছে এটা পুকুর...হ্যাঁ, সাহেবের পুকুর। তারপরে আমিই বললাম, এটা ভৈরবের রাস্তা, এটা রূপসার রাস্তা। ওরা তখন ভাবছে, বাবা এই লোকটা কী জাতিস্মর, নাকি ভুতের ভবিষ্যতের কোন ভুত? আমি বললাম, না না, আসলে মার কাছে, দিদিমার কাছে এত গল্প শুনেছি যে ছবির মত হয়ে গেছে।

ঊর্মি - এখানে একটু বলে নেওয়া ভালো, রূপসা আর ভৈরব দুটো নদী। রূপসার চেয়ে ভৈরব অনেক ছোট, তবে সেটাও নদী, নদ নয়। আসলে কোনটা যে কেন নদী আর কেন নদ সেটা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি।

সৌমিত্র - আমার ঘোরাটা খানিকটা এলোমেলো, খানিকটা ভালোলাগে বলে। যার সঙ্গে আমি সবথেকে বেশি ঘুরেছি,আমার স্ত্রী, উনিও এখানে রয়েছেন। সময়সুযোগ পেলেই ঘুরতে বেরোই...মামীমার মতো সারা পৃথিবী ঘোরার সুযোগতো পাইনি...

ঊর্মি - না না, সারা পৃথিবী আমারও ঘোরা নয়।

সৌমিত্র - যাইহোক, তাও অনেকটা পৃথিবী। তাও ঘুরি...যখন পেশার জায়গাটায় আসি...দময়ন্তী, তুমি ঠিকই বলেছ...আমি প্রথম শুটিং করতে যাই মালদা। কিন্তু সেখানে বাংলার ইতিহাসের একটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ দিক লুকিয়ে আছে, আমি জানতামনা। পাঠান সংস্কৃতি কীভাবে ওখানে ঢুকেছে এবং লক্ষণ সেনের সময়ের সংস্কৃতির সঙ্গে তার মিশ্রণ বা মধ্যযুগে সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন এটা মালদা আমাকে শিখিয়েছিল। এরপর বাঁকুড়া, বর্ধমান...তখন আমি একজন বড় গুরু পেয়ে গিয়েছিলাম...বিখ্যাত, অনেকেই নাম জানেন, তারাপদ সাঁতরা। আমরাতো শুটিংয়ের গ্রুপ নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটাও গল্পের মত, আড্ডার মতো। আমার প্রথম তিনটে ছবির ক্যামেরা করেছিল সব্যসাচী চক্রবর্তী, তখনই গোরা করে ও বেশ বিখ্যাত। আমি ওকে বললাম, তুই ক্যামেরা করলে একটা বিপদ হবে প্রচুর লোকজন দেখতে আসবে। বলল যে না না তেমন কেউ আসবেনা। বাঁকুড়ায় বহুলারা বলে একটা মন্দির আছে। সেটা এত উঁচু, টেস্থ সেঞ্চুরির মন্দির। যখন শুটিং করতে গেছি, দেখি পিলপিল করে গ্রাম থেকে লোক আসছে। প্রথমেতো আমি খুব উত্তেজিত, ভেবেছি বোধহয় শুটিং দেখতে আসছে, তারপরে দেখি আমাদের পাত্তাই দিচ্ছেনা। সবাই সব্যসাচীর অটোগ্রাফ নিচ্ছে।

www.amaderchhuti.com

মানবদার কথাও আমরা শুনব। মানবদার বইটাও আমি দেখছিলাম...সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। এখানে হীরাচরণ নার্জিনারিও আছেন। হীরাদা আবার বলবেন এইতো তোমাদের দোষ, তোমরা আদিবাসী বলতে শুধু সাঁওতাল আর মুণ্ডা আর মাহাতোদের বোঝ। আমরা যারা বোড়ো, লেপচা আমাদের কি কোন অস্তিত্বই নেই? ওই গ্রামগুলোতে গিয়েও কিন্তু আমার অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল... ছোট নদী, বোড়ো গ্রাম, বৃষ্টি পড়ছে,...বোড়ো সভ্যতার একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে।

আমার ঘোরাটা খানিকটা পেশার কারণে। যেটা দময়ন্তী প্রথমেই বলছিল, মণিপুরের কথা...মণিপুর নিয়ে যখন ছবিটা যখন প্রথম প্রথম দেখান হচ্ছে তখন খুবই উত্তেজনা, হইচই চলছে, মণিপুরের মেয়েরা, মায়েরা নগ্ন প্রতিবাদ করেছেন, সেই ছবিটি। সেইসময়ে লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করেছে যে কী আমাকে সবচেয়ে বেশি টানল? সবাই ভাবছে যে আমি বলব রক্তারক্তি ব্যাপার...সেগুলোতো নিশ্চয় আমাকে ভাবিয়েছে, ব্যথা দিয়েছে, নইলে ছবিটা আমি করলাম কেন? কিন্তু আমার ভালোলেগেছে মণিপুরের অত রক্তগঙ্গার ভেতরেও অদ্ভুত রঙের একটা সূর্য অস্ত যাচ্ছে...নীল নদী। তারপরে আমি মামীমাকেও বলেছিলাম, কোনদিন যদি সুযোগ পাওতো ঘুরে এস মৈরাং থেকে, সুভাষ বোস যেখানে প্রথম জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন...লোকতাক - এশিয়ার অন্যতম বড় হ্রদ। লোকতাকের ঠিক উল্টোদিকেই মায়ানমার। একসময় যুদ্ধ করতে রাজারা মায়ানমার থেকে আসত। ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যেটা মনে হয় অন্যরকম একটা পৃথিবী আছে, সেটা আমার ঘুরে দেখতেও ভালোলাগে, আবিষ্কার করতেও ভালোলাগে।

আরেকটা কথা মামীমা যেটা বলছিলেন, বা মানবদাও হয়তো বলবেন, সত্যি শেয়ার করতে ইচ্ছা করে। কুড়ি মিনিটের কী আধঘন্টার একটা ছবিতে হয়তো কোন একটা বিষয় নিয়ে কিছুটা চর্চা হয়, সেটা হয়তো ছবির দিকটা, কিন্তু তার বাইরেও যে কতরকম ছবি থাকে...কতরকম নদী দেখা যায়, মানুষ দেখা যায়, কতরকম প্রকৃতির কথা আমরা বুঝতে পারি, জানতে পারি, কত পাখি, কত গাছ...আমাকে এগুলো ভীষণ টানে। ইনফ্যাক্ট, আমার শ্যালক আছেন, ডঃ কল্লোল দাস, কল্লোল তো দীর্ঘদিনধরেই পাহাড়ে চড়ে, ওর পাল্লায় পড়ে আমাদেরও কিছু কিছু জায়গায় ট্রেক করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, তোরা এই পাহাড় দেখছিস, কিন্তু তোদের কখনো কি মনে হয় এগুলোর নীচে নীচে যে গ্রামগুলো আছে সেগুলোর অবস্থা কী? গ্রামগুলো কত পালটে যাচ্ছে গত পাঁচবছরধরে...দশবছরধরে...গোটা পৃথিবী কত পালটে যাচ্ছে...। চল্লিশ বছর-পঞ্চাশ বছর আগে আপাতসরল যে জীবন ছিল তা কি আছে? আমারও জানতে ইচ্ছা করে। যেখানেই যাই তাই মানুষের সঙ্গে মিশি, দেখি জনজীবন কেমন, স্থাপত্য কেমন...সেটাই এখানে চেষ্টা করলাম শেয়ার করা যায় কিনা।

ছুটির আড্ডায় দময়ন্তীর সাথে মানব চক্রবর্তী, সৌমিত্র দস্তিদার ও ঊর্মি রহমান

◆ সৌমিত্রদা, খুব ভালোলাগছে আপনার সঙ্গে গল্প করতে, এই যে দেখার ব্যাপারটা, গত সংখ্যায় কথোপকথনে বসেছিলাম রতনদার সঙ্গে - রতনলাল বিশ্বাস, রতনদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, ছবি দেখতে দেখতে আমার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। আজকে যেমন আমাদের ইচ্ছা ছিল আড্ডায় অডিয়েন্সকেও টেনে নেওয়া। পাগলের মতোই হয়তো আইডিয়াটা। কিন্তু আল্টিমেটলি জানলাম কর্ডলেস মাইক পাওয়া যায়নি।

সৌমিত্র, মানব (সমস্বরে)- মাইক ছাড়াও শোনা যাবে...শোনা যাবে...

◆ মানবকাকু, তুমিতো সদ্য অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেক করে ফিরলে, এর আগে আরওতো নানান জায়গায় গেছ, তোমার বেড়ানোর গল্প একটু বল।

মানব - প্রথমেই আমি 'আমাদের ছুটি'-র সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই...একটা ভালো কাজ হয়েছে। সাহিত্যের সভাসমিতিতো অনেকেই হয়, কিন্তু নিছক ভ্রমণ...আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিন্তু ভ্রমণ সুপ্ত আছে, কারও পাখা মেলে কারও মেলেনা। তফাত শুধু এইটুকুই। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষই প্রতিমুহূর্তে ভ্রমণের মধ্যেই আছে। আট বাই দশ ঘরে থাকলেও মনটা কিন্তু মাঝে মাঝেই উড়াল দেয়...কখনো সেটা ঘটে, কখনো ঘটেনা। সেই হিসেবে আমরা সবাই ভ্রমণকারী। তোমরা যে এই উদ্যোগটা নিয়েছ তার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ তোমাদের পাওয়া উচিত। চমৎকার অনুষ্ঠান...হলভর্তি...ওই যে বললাম, প্রত্যেকের মনের মধ্যেই একটা ভ্রমণপাখি আছে, যার সুযোগ পাচ্ছে উড়ছে, যার পাচ্ছেনা, উড়তে পারছেনা।।

◆ আর সেইজন্যই বোধহয় সবাই এখানে হাজির হয়েছেন, সেই ভ্রমণপাখিটার টানে...।

মানব - ডেফিনিটলি, এটা একটা ব্যাপার, আর দ্বিতীয় একটা ব্যাপার, আমার আরও ভালো লাগছে, এই অনুষ্ঠানের মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল রতনলাল এবং দেবাশিস থাকায়। ওরা আমাদের সমগ্র বাঙালি জাতিকে গর্বিত করেছে, এরজন্য ওদের কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। দেবাশিস, বসন্ত সিংহ রায়, রতনলাল এরা আমাদের মাথার খুব দুর্মূল্য মুকুট। এঁরা কী করেছেন তা আপনারা জানেন, কীকরবেন তাও জানতে পারবেন...সবচেয়ে বেশী বুঝতে পারবেন যখন এঁরা আর করবেননা। সেইদিন আরও বেশী করে বোঝা যাবে বাঙালি কী পারে, কী পারেনা, বাঙালির কী দুর্দম স্পৃহা। আমি নিজে তেমন কিছুই ট্রেকার নই, শখতো আছে, একটু বেশী বয়সেই শুরু করেছি পাগলামি। এই ধরো পঞ্চকেদার, ঘরের কাছে সান্দাকফু, হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার, কোস্টাল ট্রেক - পয়েন্ট ক্যালিমার টু কুড্ডালোর। সেটা আবার রতনবাবুরই লেখা থেকে নোটফোট বার করে...একবছর আগে। কিছুদিন আগে অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প করলাম। সদ্য কিশোর থেকে যৌবনে পা রাখা ছেলেমেয়েদের পাহাড়কে ভালোবাসা, প্রকৃতি মুখী করার আমার একটা টেনডেন্সি আছে। সেটা শুরু করেছিলাম আমার ছেলেকে দিয়ে...সান্দাকফু ঘুরে আসার থেকে ও আমাকে বলে, আমি দিল্লি-বোম্বে যাবনা বাবা, আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে চল...ওকে নিয়ে এবারে ঘুরে এলাম, আজকেও নিয়ে এসেছি। ও খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছে, শুনছে...দেবাশিস, রতনলালের নাম এত শুনেছে, এখন চাক্ষুস দেখছে, এটা আমার কাছেও একটা বড় প্রাপ্তি।

ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের বিরাট একটা বিস্তৃতি হয়। পাহাড়ের কাছে গেলে বোঝা যায় যে উচ্চতায় আছে, তার চেয়ে আমরা মানুষ কত দীন, কত হীন, কত ছোট। এর পাশাপাশি এটাও সত্য যে কোনকিছুই অগম্য নয়, কোনকিছুই দুর্গমনীয় নয়। একজন বিখ্যাত পর্বতারোহীর কথা আছে - ম্যান ইজ সিক্স ফিট টলার দ্যান এভারেস্ট। অর্থাৎ এভারেস্টের মাথার ওপর যে লোকটা দাঁড়ায় সেও কিন্তু এভারেস্টের থেকে ছ'ফিট উঁচুতে থাকে। সুতরাং এভরিথিং ইজ পসিবিল। আমি ষাট পেরিয়েছি, আমি দেখেছি সত্তর বছরের এক অস্ট্রেলিয়ান দোর্দণ্ড পদক্ষেপে এবিসি-র দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, এক হাঁটু বরফের মধ্যে। এবছর প্রচণ্ড আইসফল হয়েছে। মৎসপুছাড় বেস ক্যাম্পে সারারাত ধরে বরফ পড়ে গেছে। সকালে উঠে দেখছি ধু ধু বরফে ঢাকা। আমরা শুধু অপেক্ষা করছিলাম ওই ভদ্রলোকের জন্য। উনি যেই বেরিয়ে গেলেন, ওঁর ফুটপ্রিন্ট ধরে ধরে আমরাও এগিয়ে গেলাম। আসলে বয়সটা কোন ফ্যাক্টর নয়। পাহাড়কে ভালোবাসা, প্রকৃতিকে ভালোবাসা...

একটু আগেই সৌমিত্রদা আরেকটা কথা বলছিলেন, সেখানকার মানুষ, সত্যি তাদের সততার কোন তুলনা নেই। যদি সামান্য কিছু বিচ্যুতি ঘটে থাকে তা আমাদের মত সমতলের লোকেদের জন্য, একথা বলতে আমি দ্বিধা করিনা। আমরা সস্তার লজেন্স, বিস্কুট দিয়ে ওদের মন জয় করার চেষ্টা করি। কিন্তু ওদের যে প্রকৃত সমস্যা...আমরা কজন ট্রেক শেষ হওয়ার পর ওদের সমস্ত ওষুধপত্র দিয়ে আসি? আমরা কজন ব্যবহার করা প্লাস্টিক নিজেদের স্যাকে রেখে আবার সমতলে এসে ফেলব, তা করি? এখন ভারতীয় আর নেপাল হিমালয়ান রেঞ্জে যে মাত্রায় পলিউশন হচ্ছে তা অকল্পনীয়। শুধুমাত্র এভারেস্ট রিজিওনে 'ক্লীন এভারেস্ট' বলে একটি অভিযান সংগঠিত হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিযাত্রীদের নিয়ে, সেখানে বিশ টন, বাইশ টন ওয়েস্ট বার করা হয়।

পাহাড় আমাদের যে উচ্চতার কাছে নিয়ে যায়, সমুদ্র যে গভীরতার কাছে নিয়ে যায়, এটা মানুষের মনে একটা বিরাট ফেলো ফিলিং তৈরি করে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার পেছনের লোকের কষ্ট হচ্ছে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, নাহয় কিছুক্ষণ ওর স্যাকটা আমি টেনে দিলাম। এই ফেলো ফিলিংটা কিন্তু জীবনের বড় প্রাপ্তি। আজকে আমরা কী দেখছি...কলকাতাতেই তো বাপি সেন মারা গেল, চোখের সামনে অ্যাসল্ট হচ্ছে কেউ দেখছেনা, চলে যাচ্ছে...আমার বন্ধু তরুণ লেখক সৌগত ঘোষ কলকাতার রাস্তায় পড়ে রক্তপাত হতে হতে মারা গেল। একজন পাহাড়কে ভালোবাসা লোক, একজন প্রকৃতিকে ভালোবাসা লোক, একজন ট্রেকিংকে ভালোবাসা লোক, একজন অজানার সন্ধানে ছুটে যাওয়া লোক কিন্তু একজন অসুস্থ লোককে দেখলে পালিয়ে যাবেনা। অবশ্যই তাকে তুলবে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ তার ভেতরের সেট আপটাই সেভাবে তৈরি হয়ে গেছে। পাহাড়কে বা জঙ্গলকে ভালোবাসায় মানুষের ভেতরের যে জিনিসটা প্রকাশিত হয়, সেটাই আমাদের বোঝাতে হবে তরুণদের কাছে, কিশোরদের কাছে। আমাদের তো অনেক বয়েস হয়ে গেছে, কষ্ট হয়। কিন্তু যাদের শরীরে সেই সক্ষমতা আছে, অল্পবয়স, তারা যখন ইন্টারেস্টেড হবে তখন আসল সুফল পাবে আমাদের সমাজ। সব কিছুর পেছনেইতো একটা সোশ্যাল কমিটমেন্ট আছে। এই যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসগুলো আছে, স্কুল-কলেজের ছেলেরা যত বেশি এতে যাবে, তত শুভ প্রবৃত্তিগুলো জাগরিত হবে। এই মোটো নিয়েই আমি এখনো ঘুরে বেড়াই। এই ভালোবাসাটা বেঁচে থাকুক। বিবেকানন্দ একটা খুব মজার কথা বলেছিলেন, জ্ঞান হচ্ছে সমুদ্র, তুমিতো পুরো সমুদ্রের জল পান করতে পারোনা যে তুমি জ্ঞানী হবে। তুমি কী করতে পার? তোমার হাতে একটা কাপ আছে, তা দিয়ে তুমি তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পার। অর্থাৎ তোমার যতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন ততটুকু তুমি সমুদ্র থেকে অর্জন করতে পার। আমিও তাই বলি, এই পৃথিবী বিশাল বৈচিত্র্যময়। ঘুরে বেড়ানোর শেষ নেই। ভারতবর্ষ শেষ করতেই জীবন চলে যাবে। সুতরাং, তাতো হবেনা। আমার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য দু'চার কাপ যদি আমি সংগ্রহ করতে পারলাম, আমি তাতেই তৃপ্ত।

www.amaderchhuti.com

◆ আলপনা - মানব, তোমাকেতো অনেকদিনধরে দেখছি...তোমার অনেকগুলো দিক, এরমধ্যে ভ্রামণিক মানবকেই আমরা এখন দেখছি। পাহাড়ের কথা তো বললে কিন্তু সমতলে তোমার যে ভ্রমণ, তোমার একটা সঙ্গীও ছিল, ওয়্যান্ডার। আর তুমি যেখানে থাক, তার নাড়ি-নক্ষত্র, অলিগলি সবকিছু তুমি জানো বা জানার চেষ্টা কর। ভ্রমণ করতে গেলে ভালোবাসা চাই, সাহস চাই এবং জানার আগ্রহ, সবথেকে বড় কথা বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা যেটা তোমার মধ্যে আছে।

মানব - বৌদির এই প্রসঙ্গ ধরে বলি, আমার একটা স্কুটার ছিল তার নাম 'ওয়্যান্ডার'। আমি জানিনা অযান্ত্রিকে গাড়িটার নাম ঠিক কী ছিল...

সুগত -'জগদ্দল'।

মানব - হ্যাঁ জগদ্দল। কিন্তু অযান্ত্রিকের সঙ্গে আমার গল্পটার একটা তফাত আছে, আমার ওয়্যান্ডার আমাকে বিপদ থেকে সচেতন করে দিত। আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা বলছি, তখন খুব ডিস্টার্বড জায়গা, ওই দিকটায় কেউ যেতোনা। মেদিনীপুর, গোপীবল্লভপুর হয়ে, উড়িষ্যা হয়ে, বারিপদা হয়ে লুলুং চলে গেলাম। লুলুং থেকে চলে গেলাম বিশই পাহাড় বলে একটা জায়গা। স্কুটার যতদূর যায়, তারপরে লক করে রেখে দিই, সেখানে গ্রামে গিয়ে রাত কাটালাম। সকালে উঠে দেখি আমার স্কুটারের ওপর একটা বাঁদর বসে লুকিং গ্লাসে মুখ দেখছে। চারপাশটা কুয়াশায় ভিজে আছে। দৃশ্যটা দেখে ছবি তুললাম। ওয়্যান্ডারকে নিয়ে একটা গল্প লিখলাম গল্পটার নাম 'ওয়্যান্ডারের মৃত্যু', ওই নামে আমার একটা গল্প সঙ্কলনও আছে। যেখানে কাউকে চিনিনা তেমন জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম ওয়্যান্ডারের সঙ্গে।

◆ আলপনা - তোমার ভ্রমণ আর গল্প-উপন্যাস লেখা - এর মধ্যে সম্পর্কটা কী? 'সভ্যতার রথ'-এ বোধহয় সেই উত্তরটা আছে।

মানব - এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। আসলে ভ্রমণ একটা জিনিস, সাহিত্য একটা অন্য জিনিস। বিশেষ করে ফিকশন। ফিকশনের মধ্যে লেখকের কল্পনাশক্তি কাজ করে। ভ্রমণে কিন্তু তা করেনা। উমাপ্রসাদের যে ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে, বা আমাদের বাংলাসাহিত্যে চিরকালীন যেসব নামকরা ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে, ভ্রমণকাহিনী পড়ার মানসিকতা নিয়ে পড়লে সেটা ভালো লাগবে, আদারওয়াইজ, আমি যদি তারমধ্যে গল্প-উপন্যাসের আদল খুঁজি, আমার কিন্তু ভালো লাগবেনা। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-তেও সমরেশ বসুকে মূল ভ্রমণকাহিনী থেকে সরে মানবিক আখ্যানের দিকে ঢুকতে হয়েছিল। মানবিক আখ্যানটাকে বাদ দিয়ে শুধু ভ্রমণকাহিনী কিন্তু ততটা আকর্ষণীয় হয়না। তাই ক্রিয়েটিভ লেখক চেষ্টা করে চরিত্রগুলোকে নিজের মতো গড়ে নিতে, কিন্তু পাহাড়কে তো আর নিজের মতো গড়া যায়না, সেতো শাশ্বত, প্রকৃতির সৃষ্টি, সেইজায়গায় একজন লেখক মার খায়। তবু বলছি, আজ থেকে পনের বছর আগে যখন আমি প্রথম সান্দাকফু যাই, তখন একটা উপন্যাস লিখি। কলকাতার 'দিশা' বলে একটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। নাম দিয়েছিলাম, 'শীর্ষতা'। তাতে আমি একটা জিনিস দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম, একজন মানুষ যখন উঠতে উঠতে একেবারে ওপরে পৌঁছে যায়, সর্বোচ্চ জায়গায় চলে যায়, ধরুন, এভারেস্টে যায়, আর তো তার ওপরে যাওয়ার জায়গা নেই। ওখানে একটা ফিলোজফি কাজ করছিল - একদম এক্সট্রিম ওপরের পর আবার ডিসেন্ডিং শুরু হয়। অবতরণ একসময় শুরু করতেই হবে। আমি ভ্রমণকাহিনী সেভাবে লিখিনি, কিছু পত্রপত্রিকায় লিখেছি। কিন্তু তা কতটা সাহিত্য আমার নিজেরই সন্দেহ আছে।

সুগত - আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আড্ডাটাতো খুব সুন্দর জমে উঠেছে, খুব ভালোই লাগছে, আমরাও খুব ইনভলভড হয়ে পড়ছি। আপনাদের তিনজনের কাছেই আমার এই প্রশ্নটা, আপনাদের ভ্রমণের সময়ে আপনারা সেরকম ভয়ঙ্কর কোন অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছেন কিনা বা সেরকম নাড়া দেওয়ার মতো কোন ঘটনা যদি আপনাদের কাছে থাকে। সেটা যদি আমাদের একটু বলেন তো খুব ভালোলাগবে।

◆ আমারতো মনে হয় বিপদ ঘটার মতো জায়গার কথা ভাল বলতে পারবেন দেবাশিসদা। এবারে যে অন্নপূর্ণা শিখর ছুঁয়ে এলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা একটু বলুননা।

(মাইক হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আড্ডা জমিয়ে তোলেন দেবাশিস বিশ্বাস)

দেবাশিস - আসলে বিপদের মধ্যেইতো আমরা যাই, আমরা জেনেই যাই যে এটা কতটা বিপদসঙ্কুল। আমি হয়তো যেটা ভাবছি তেমন বিপদ না, সেটা বেশী ডিটেলসে বললে হয়তো মনে হবে মারাত্মক একটা জিনিস। এভারেস্টে গিয়েছিলাম ২০১০-এ। টোটাল আটান্ন দিন লেগেছিল। প্রতিদিন কিছু না কিছু তো

ঘটেইছিল, আসলে ছোট করে বলাটা খুব মুস্কিল। আটান্ন দিন ধরে বললেও হয়তো শেষ করতে পারবনা। আমরা দক্ষিণ দিক দিয়ে গিয়েছিলাম। দুদিক থেকে ক্লাইম্ব করা যায় - চিনের দিক থেকে আর নেপালের দিক থেকে। সেবছর চিন সরকার কাউকে পারমিশন দিচ্ছিলনা। নেপালে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পর্যন্ত অনেকেই যান, সেখানপর্যন্ত বলার মতো কোন ঘটনাই নেই। এভারেস্ট বেসক্যাম্পের পরে খুম্বু আইসফলটা পড়ে, ফুটিফাটা একটা এলাকা, সেটা পার হওয়াটা কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং। বিপজ্জনক বলবনা, কারণ আমরা জেনেই গেছি, পড়াশোনা করেই গিয়েছিলাম যে কতটা বিপদ আছে। সেটা ওভারকাম করতে হবে, এটা আমাদের মাথায় থাকে সবসময়। তবে বিপদের ভয়টা যদি মাথায় চলে আসে, এইধরণের বড় এক্সপেডিশনে যদি কোন হেজিটেসন আসে, তখন তার ব্যাক করে আসাই ভালো।

যেকোন বরফের নদী আমরা জানি মুভ করে, ওপর থেকে নীচের দিকে আসে। লিকুইড আর সলিডের মধ্যে ফারাকের জন্য এটা যেকোন বাঁকে ক্র্যাক হতে থাকে। কোনসময় যখন আড়াআড়ি টার্ন নেয় তখন কোনাকুনি ক্র্যাক আসে - ক্রিভার্স বলে। নীচে যদি কোন উঁচুনীচু থাকে, তখন অন্য একটা ক্র্যাক আসে - এরকম দুরকম ফাটল আসে। ছোট ছোট ফাটলগুলো - এক ফুট, দেড় ফুট আমরা লাফিয়ে পার হই। কিন্তু যখন বড় ফাটল হয়, তখন তার ওপরে মই পাততে হয়, কোনসময় একটা, দুটো ... খুম্বু আইসফলে দেখা গেছে অনেকসময় পাঁচটা-ছ'টা মইও একটা সেট থেকে আরেকটা সেটে যাওয়ার জন্য বাঁধতে হয়। নীচ থেকে মনে হয় যে মইয়ের ওপর দিয়ে কিভাবে যাব, পায়ে ক্র্যাম্পন থাকে, ব্যালেন্স করাটা খুব মুস্কিল। এতো বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া নয়ত যে রেলিংটা ধরলাম। একটা দড়ি দেওয়া থাকে। তবে দড়ি ধরে কোন সাপোর্ট নেওয়ার থেকে না নেওয়াই ভালো, পায়ের ওপর দাঁড়ানোটাই ভালো। সিঙ্গল ল্যাডারের ওপর দিয়ে হাঁটা সহজ, কিন্তু যখন দুটো বা তিনটে-চারটে জোড়া থাকে তখন কাঁপতে শুরু করে। আর নিচের দিকে যখন তাকিয়ে দেখছি যে অন্ধকার তখন মনের কোন জায়গায় একটা কাজ করে যে ঠিকঠাক যেতে পারব কিনা। খুব চ্যালেঞ্জিং, প্রতিটা ক্রিভার্স পার হওয়ার পর মনে একটা স্যাটিসফেকশন আসে যে এটাও পেরে গেলাম। এটা একবার করলে হয়না, বারেবারে করতে হয়, অ্যাক্লেমাটাইজ করার জন্য। আমরাতো একেবারেই জিরো লেভেলের মানুষ। সি লেভেল থেকে বড়জোর তিরিশ ফুট, চল্লিশ ফুট - আর আমরা যাচ্ছি উনত্রিশ হাজার ফুটে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা - মাইনাস পঁচিশ, মাইনাস তিরিশ...হাওয়া বাড়লে মাইনাস পঞ্চাশেও নেমে যেতে পারে। এভারেস্টের মাথার দিকে আটহাজার, সাড়ে আটহাজার মিটারের ওপরে প্রচণ্ড হাওয়া - ১৮০-১৮৫ কিলোমিটার পার আওয়ার। একটা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেখানে খাপ খাইয়ে নিতে হয় - প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কীংবা প্রচণ্ড হাওয়া, বাতাসে অক্সিজেন খুব কম, বাতাসের প্রেসারও খুব কম। বারেবারে পার হতে হয়, আমাদের খুম্বু গ্লেসিয়ার তিনচারবার ক্রস করতে হয়েছিল। একবার এরকম নীচে নামছিলাম, তখন আমাদের দুবার ওঠানামা হয়ে গেছে, নামার সময় দেখছি কয়েকজন ফরেনারকে একজন শেরপা দেখাচ্ছে কীকরে এই ল্যাডার ক্রস করতে হয়। আমাদের ওপর থেকে নামতে দেখে সরে গেছে। আমি নামতে গিয়ে পায়ের ক্র্যাম্পনদুটো ফাঁকের মাঝখানে আটকে গেল, আটকে যাওয়ামাত্র আমি পা টানতে গিয়ে পড়ে গেলাম। আমাদের সাইডে যে দড়িটা থাকে তার একটা ছোট্ট এক্সটেনসন থাকে কোমরে বাঁধা, তার মাথায় একটা ক্যারাবিনার থাকে, ছোট্ট সেফটিপিনের মতো, কিন্তু অনেক ওয়েট ক্যারি করতে পারে। আমরা যদি পড়েও যাই তাহলে একেবারে নীচের গর্তে পড়বনা, ঝুলতে থাকব। কিন্তু যদি দড়িতে ঝুলি তাহলে শরীরটাকে টেনে তোলা কিন্তু খুব কঠিন। ওইটুকু ঝোলাতেই কিন্তু প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার মতো কষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমি পারলামনা, যখনই টাল খেয়ে গিয়েছিলাম, তখনই রিফ্লেক্স হোক আর যাই হোক, দুপাশে পা দিয়ে বসে পড়লাম, ঘোড়ার পিঠে বসার মত। যখন উঠলাম, আমার মনে হল, যাদের শেখাচ্ছে তারা হয়তো ভয় পেয়ে যেতে পারে। তাদেরতো প্রথমদিন শেখাচ্ছে কীভাবে ক্রিভার্স ক্রস করতে হয়। আমি বললাম, যদি কোনসময় তোমাদের পা ফসকে যায়, তাহলে এভাবেই বসে যাবে। আমি বুঝতে দিলামনা যে আমি পড়ে গেছি, ওরা ভাবল হয়ত ওদের ডেমোনস্ট্রেশন দিল একটা।

এরকম ঘটনাতো অনেক থাকে। যেমন এভারেস্টের আরেকটা ঘটনা বলি, ক্যাম্প থ্রি উঠে গেছি, উঠে আবার নেমে এসেছি। তো ক্যাম্প থ্রি-র জায়গাটায় এভারেস্টের সাইডে লোৎসে বলে একটা পিক আছে, ফোর্থ হায়েস্ট পিক। তার ওয়ালে আইস কেটে পাব লাগাতে হয়। ওখানে কিছু হাম্প - বরফের ঢিপের মতো থাকে, ওটা হ্যাঙ্গিং গ্লেসিয়ারের মতো। সেগুলো ভেঙ্গে পড়ার ভয় থাকে। আবার যখন উঠে ক্যাম্প থ্রি শিফট করব, গিয়ে দেখি ওপর থেকে হ্যাম্প ভেঙ্গে তাঁবুগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এটা কিন্তু আমরা থাকতেও হতে পারত। বিপদ কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই আছে। আমরা যখন চার নম্বর ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছি, সাউথ কল, তখন দেখছি একজন রাশিয়ান মারা গেছে, তাকে নামিয়ে আনছে, অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেকোনসময়েই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। আমি যে অক্সিজেন মাস্ক ইউজ করছি সেটার পাইপটা হয়তো ফুটো হয়ে গেল। সাড়ে আটহাজার-নহাজার মিটারের ওপরে যদি মাস্কটা কোনকারণে কাজ না করে আমারতো মনে হবে আমাকে বালিশ চাপা দিয়ে রেখেছে, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাব।

www.amaderchhuti.com

এবছর অন্নপূর্ণায় গেছিলাম, অন্নপূর্ণাকে তো বলে কিলার মাউন্টেন। মোট চোদ্দটা আটহাজারের মিটারের ওপর পিকের মধ্যে সবথেকে আগে ক্লাইম্ব হয়েছে অন্নপূর্ণা ১৯৫০ সালে। আবার সবচেয়ে কম ক্লাইম্বও হয়েছে এটা। আর সবথেকে বেশী ডেথ এখানে হয়েছে, সবথেকে বেশী অ্যাক্সিডেন্ট। যেকারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অ্যাভালাঞ্চ নামে। একটা জায়গায় একটা নালার মত আছে। ওটা ক্রস করতে হয়। তার উপরে বিশাল জায়গা জুড়ে প্রতিমুহূর্তেই ভাঙ্গতে পারে। ভাঙ্গলে ওই নালাতেই আসবে। ফুডোয়ার্ক বলে আমাদের মাউন্টেনিয়ারিং-এর ভাষায়। আমাদের জানাই ছিল যে ওটা দিয়ে অ্যাভালাঞ্চ আসে, যত তাড়াতাড়ি পারবে ক্রস করবে। কিন্তু এতো কলকাতার রাস্তা না যে দৌড় মারলাম। আমি একটা আইস ওয়ালে ক্লাইম্ব করছি। আমাদের যদি আধঘন্টা-চল্লিশ মিনিট টাইম লাগে আমাকে ওই সময় ধরেই ক্লাইম্ব করতে হবে। যদি অ্যাভালাঞ্চ আসে আমাকে সেটা মেনে নিতে হবে। এবং আসলও, আমরা যখন ক্রস করছিলাম, ক্যাম্প টু থেকে ক্যাম্প থ্রি, বিরাট একটা অ্যাভালাঞ্চ আসল। প্রথমে আমার যেটা কাজ করল, সৌমিত্রদা যেটা বলছিলেন, শেয়ার করা, আমরা যে চোখটা দিয়ে দেখছি, আমিতো খুব রেয়ার জায়গায় গেছি, কালকে আবার ইচ্ছা হলে আমি সেখানটায় যেতে পারবনা। সেখানকার প্রচুর ছবি তুলি, রতনদাও যে ছবি তুলে নিয়ে আসে, তার পিছনেও ওই মোটিভেশনটাই কাজ করে যে শেয়ার করব সবার সঙ্গে। যখন অ্যাভালাঞ্চের আওয়াজটা আসল তখন আমার মাথায় প্রথমেই এল ক্যামেরাটা বের করি। মরতে মরতে অ্যাভালাঞ্চের ছবিটা তুলে নিয়ে আসি। আমি না থাকি, ক্যামেরাতো থাকবে। কিন্তু ক্যামেরা বের করার আগেই অ্যাভালাঞ্চ নেমে চলে এল। প্রচণ্ড বড় একটা অ্যাভালাঞ্চ আসল, কিন্তু কপাল ভালো যে ওইযে স্নো...আমরা বাংলায় সবই বরফ বলে দিই, কিন্তু আইস আর স্নো-র তফাত আছে। স্নো একেবারে গুঁড়ো বরফ - নানারকম শেপ থাকে - পাউডারের মতন, পেঁজা তুলোর মতন, সাবুদানার মতন। পাউডার স্নোগুলো আমার গায়ের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আইসের চাঙ্কগুলো যে নামল, প্রচুর বড় একটা, সেটা কিন্তু ডান সাইড দিয়ে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে কিছুটা নালা ক্রস করে বাইরে চলে এসেছি। সেদিনই আবার অ্যাভালাঞ্চ আসে, যখন আমরা ক্যাম্প থ্রিতে গিয়ে তাঁবু খাটালাম। অনেকগুলো তাঁবু ছিল। আমরা তুষারধ্বস বলি, কিন্তু সবসময় ওটা ঠিক অ্যাভালাঞ্চ নয়। ওপর থেকে একটা আইসব্লক ভেঙ্গে আসল। অ্যাভালাঞ্চ আসে কিন্তু আইসব্লক সচরাচর আসেনা। পাশেই একটা বড় ওয়াচটাওয়ার ছিল, সেটা ভেঙ্গে চলে এসেছিল। পাশের দুটো তাঁবু পুরো গুঁড়িয়ে দিল। অনেক মাউন্টেনিয়ার উঠছিল, তারা পরেরদিন খুব ভয় পেয়ে গেল এই দুটো ঘটনায়। পরেরদিন ১৮ তারিখ সকালবেলায় সবাই নীচে চলে গেল। আমরা অনেক পরে শুরু করেছিলাম। ওরা ২৬ মার্চ থেকে ওখানে বসে আছে, বারেবারে ওঠানামা করেছে। আমরা ৯ এপ্রিল পৌঁছেছিলাম। ১০ তারিখ রেস্ট নিয়ে ১১ তারিখ ওঠা শুরু করেছিলাম। এদিন আমরা ডিসিশন নিলাম, নামবনা নীচে, ওপরের দিকে উঠে যাব। ক্যাম্প থ্রি উঠে এসেছি, এবার সামিটের দিকে যাব। আমরা কিন্তু তারপরে ১৯ তারিখ রাতে বেরিয়ে ২০ তারিখ সামিট করলাম।

মানববাবু বললেননা যে অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্পে গিয়েছিলেন, খুব বাজে ওয়েদার ছিল। পুরো হিমালয়েই খুব বাজে ওয়েদার ছিল। অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অনেকে মারাও গেছেন। দিল্লির একটি ছেলে অর্জুন বাজপেয়ী, বুকে জল জমে গেছে, পালমোনারি এডিমার জন্য নামিয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের ভাগ্যটা এতটাই ভালো পরেরদিন উঠে গেলাম, সামিট হল। সেই বিদেশিরা কিন্তু এখনও বসে আছে, সামিট হয়নি। হয়তো মা অন্নপূর্ণা চেয়েছিলেন আমরা ক্লাইম্ব করে আসি, তাই দশদিনের মধ্যে আমরা ক্লাইম্ব করে আসতে পেরেছি। বিপদের গল্প করলেতো প্রচুর গল্প। আমি অনেক এক্সপেডিশনে গেছি, তবে সবাই জানে এভারেস্ট থেকেই।

মানব - আমার একটা প্রশ্ন আছে। একটা এক্সপেডিসনের আগে কীরকম শারীরিক প্রস্তুতি নাও? অনেক তরুণ ছেলেমেয়েরা জানতে চায়।

দেবাশিস - একটু খাটতে হয়। আমি প্রচুর দৌড়োই। এখন আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে আমাকে বারণ না করলে হয়তো আমি দৌড়তেই থাকব। আর ফ্রীহ্যান্ড করি। ব্রিদিং প্র্যাকটিস। এখন আমি অনেকক্ষণ শ্বাস না নিয়েও থাকতে পারি। তবে পাহাড়ে যাওয়া, আমি আটহাজার মিটারের কথা বলছিনা, সে সান্দাকফুই হোকনা কেন, সবেতেই কিন্তু শারীরিক জোরের থেকে মানসিক জোরটা বেশি জরুরি। আমি যদি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি, আমি কোনদিনও বিকেভঞ্জন থেকেই সান্দাকফু উঠতে পারবনা। আমাদের কী হয় এখন, মনে হয়, আমি ওইখানে গেছিতো, এটা কিছু হবেনা। ওটাই আমার মানসিক জোরটা বাড়িয়ে দেয়।

তেষট্টিদিন ধরে আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘার অভিযান চলেছিল...

◆ 'আমাদের ছুটি'-র এই সংখ্যায় দেবাশিসদার কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে লেখাটা বেরিয়েছে।

দেবাশিস - খুব ভালো করেছে আমি দেখেছি। দু-তিন পৃষ্ঠায়তো পুরোটা ধরান সম্ভব নয়, একেবারে টাচ করে গেছি। আমি ওদের বললাম, আমিতো আর ফেসবুক খুলে নিজেরটা ভালো হয়েছে সেটা কমেন্টস করতে পারিনা, শুধু লাইক করে দিয়েছি। প্রেজেন্টেসনটা ভালো হয়েছে। 'আমাদের ছুটি'-র এই প্রোগ্রামটা খুব ভালো, দময়ন্তী আমাকে যখন বলেছে, প্রথমেই বলেছিল, আমি বললাম আগেরদিন একটু আমায় ফোন করে দিও, আমি নিশ্চয় আসব। আমরা যেমন একটা থেকে আরেকটা শৃঙ্গে আরোহণ করছি আমিও চাইব 'আমাদের ছুটি' যাতে প্রকাশনার জগতে এভারেস্টের মত উচ্চতায় উঠুক।

◆ অনেক ধন্যবাদ দেবাশিসদা।

শ্রোতা - অত ওপরে যখন যান, তখন জলতো জমে যায়, জলটা কীভাবে পান?

দেবাশিস - ওপরে যখন যাই, জল জমে যায়। বললামই যে মাইনাস তিরিশ, মাইনাস চল্লিশ...আমি ফেদার জ্যাকেটের ভেতরেও ছোট বোতলে জল রাখার চেষ্টা করেছি, দুশো মিলিলিটারের বোতল, জমে গেছে। জল খাওয়া যায়নি। আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বেরিয়ে সামিট করে ফিরে এসেছি সাড়ে আঠাশ ঘন্টায়, একফোঁটা জল পাইনি। অন্নপূর্ণাতেও আগেরদিন রাত দশটায় বেরিয়ে পৌঁছেছি পরেরদিন সকাল দশটা-সাড়ে দশটায়, আবার ফিরে এসেছি বিকেল চারটে নাগাদ। একফোঁটা জল পাইনি। জল ছাড়াই যেতে হয়েছিল।

◆আমাদের সময় সীমিত হয়ে গেছে, আমি সৌমিত্রদাকে একটা প্রশ্নের ভেতর দিয়ে আমাদের আড্ডাটা শেষ করব। সৌমিত্রদা, পাহাড় থেকে এবার কলকাতায় ফিরি। আপনার 'ইতিহাসের কলকাতা' তথ্যচিত্র রয়েছে, আপনার 'এলোমেলো' বইটাতেও কলকাতার কথা পড়েছিলাম। সেদিনকেও আড্ডা দিতে গিয়ে আপনি বলছিলেন এখনও কলকাতার অলিতেগলিতে আপনি ঘুরে বেড়ান। কলকাতা নিয়ে একটু আমাদের বলুন।

সৌমিত্র - প্রথম কথা হচ্ছে যে দেবাশিসের বলার পর অতটা উচ্চতায় গিয়ে আবার কলকাতায় ফিরব! আমি যে কোথায় চলে গেছি...

◆ওই জন্যইতো একটু বাস্তবে ফিরে আসতে চাইছি।

সৌমিত্র - ছোটবেলায় স্কুলে পড়তে ডিউক, পিনাকী বলে দু'জন আন্দামানে গিয়েছিল, আমরা তাদের দেখতে ভিড় করেছিলাম। আর তখন ভাবতেই পারিনি যে আমার সামনে দেবাশিসের মত একটা ছেলে বসে থাকবে, যে এভারেস্টের মাথায় উঠে গেছে! আমরাতো পাঁচ ফুট দু ইঞ্চির বাঙালি - আমাদের যাওয়া মানে দীঘা আর পুরী...

কলকাতা মানে, ওই যে বললামনা তারাপদ সাঁতরার পাল্লায় পড়েছিলাম, ওঁর কাজই ছিল পায়ে হেঁটে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ানো। কলকাতাতেও উনি আমায় বলতেন, এইটা দেখ, ওইটা দেখ, কতরকমের স্থাপত্যরীতি আছে। তার আগেতো সবাই যেমন কলকাতা দেখে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তাই দেখতাম কী বড়জোর দুচারটে সাধারণ বইটই পড়লাম। ওনার এক চেলা, সে এখন প্রায়শই লেখে, দেবাশিস বোস, পেশায় ডাক্তার, নেশায় কলকাতা গবেষক, বাংলার ইতিহাস নিয়ে কাজ করে আরকী। দেবাশিস প্রথমেই বলল, ওগুলো ফেলে দাও। বললাম, ফেলে দেব কেন? ও বলল, কারণটা হচ্ছে, ওরা কেউ পায়ে হেঁটে দেখেনি। তুমি যদি পার, পায়ে হাঁটতে শুরু কর। এইভাবেই কলকাতা দেখা। তবে কলকাতায় তো এত চমৎকার, চমৎকার জায়গা আছে - মাইকেল কোথায় ব্যাপটাইজড হয়েছিলেন, সেইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চার্চ। গোটা কলকাতা সেদিন ভাগ হয়ে গিয়েছিল, গোঁড়া হিন্দুরাতো প্রায় বিক্ষোভই ডেকে ফেলেছিল। বা ধর যেখানে জব চার্ণকের সমাধি আছে। এইগুলো যেমন সাহেব কলকাতা। ঠিক তেমনি আমার দেখতে ইচ্ছা করে, জানতে ইচ্ছা করে হাতিবাগান নামটা কেমন, কোথায় হাতিরা ছিল আরকী, হালসিবাগানটা কোথায় ছিল। আবার আমরা জোড়াবাগান বলতে যে জায়গাটা বুঝি, ইতিহাস তা বলেনা। ইতিহাস বলে যে, সেটা আসলে রোড টু জোড়াবাগান। যে জায়গাটাকে আমরা চিৎপুর বলি সেটা হল রোড টু চিৎপুর। ডেভিড হেয়ার যেখানে থাকতেন, যেটা এখন নিক্কো হাউস হয়েছে বা আলেকজান্ডার ডাফ যেখানে থাকতেন, ঘটনাচক্রে আমি সেই কলেজেই পড়তাম - স্কটিশ চার্চ কলেজ -১৭৫ বছরের ছবিটাও আমাকেই করতে হয়েছিল। আমার মাস্টারমশাই অলোক রায় বলেছিলেন যে লাইব্রেরিতে দেখলে হয়তো মিনিটস পেতে পার। সেটা দেখে শিহরিত হয়েছিলাম যে আলেকজান্ডার ডাফ স্কটিশচার্চ কলেজ প্রতিষ্ঠা করছেন। আমার কলকাতা দেখা খানিকটা হচ্ছে ওই, বই ঘাঁটা, দেখতে দেখতে নতুন করে ভাবা...

আরেকটা কথা এইখানে বলি, যেটা মানবদা ধন্যবাদ জানিয়েছে, আমিও দময়ন্তী আর রত্নদীপকে বলব...কিন্তু আমার একটা কোথায় ভয় হয় এভারেস্ট যতই পড়ি পাতার পর পাতা, এটা যে চট করে সাহস নিয়ে কেউ যাবেনা, কিন্তু এটা কী হয়, কষ্ট লাগে যে, বাঙালি ঘুরতে ভালোবাসে এটা যেমন সত্যি ঠিক তেমনি বলে, আচ্ছা, এখানে বাঘ দেখা যাবেনা? এমন চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে যে, আপনারা বলেছিলেন, বাঘ আসবে, কই বাঘতো এলনা!!! আবার কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, অমুক জায়গায় যাচ্ছি,কী দেখার আছে বলুনতো? আমার বউ একবার আমায় শর্ত দিল যে পুজোর সময় আমরা এমন জায়গায় বেড়াতে যাব সেখানে যেন কোন বঙ্গসন্তানের দেখা না পাওয়া যায়। আমি বললাম, এরকম বিরল ঘটনা চাঁদ ছাড়া আর কোথাও আছে বলে আমি জানিনা। যাইহোক, আমরা তার আগে পশ্চিম উড়িষ্যার একটা জায়গায় শুটিং করতে গিয়েছিলাম, লামটাপুট। গদোবা আদিবাসীদের জায়গা, সেটা হচ্ছে কোরাপুট হয়ে মাচকুণ্ড বলে একটা জায়গা আছে, সেইখানে। এর একদিকে উড়িষ্যা আর অন্যদিকে অন্ধ্র - দোদামার ডাক - বিখ্যাত লেখাও আছে, মানবদা ভালো বলতে পারবেন। মাচকুণ্ড হয়ে আওরা গুনাইপাড়া হাটে আসছি, অসাধারণ একটা সূর্য অস্ত যাচ্ছে...কোন বইতেও নেই, হাজার ছবি তুললেও হয়তো পাওয়া যাবেনা। হঠাৎ করে মনে হল সামনে দিয়ে কারা যেন যাচ্ছে কুকুরের মত। গাড়িটা থামাতে বললাম - অসম্ভব সুন্দর একটা নেকড়ে দম্পতি, তারা বিস্মিত হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আমরাও দেখছি...। আমাদের সঙ্গে দুজন বঙ্গসন্তান ছিলেন, আমাদেরই বন্ধু, তাঁরা এত চিৎকার করতে লাগলেন, ওরে ওরে দেখ নেকড়ে, নেকড়ে...নেকড়েতো সেই যে গেছে, আমার ধারণা আজ অব্দি তারা ওখানে ফিরে আসেনি...

অ্যাডভেঞ্চারের কথা বললে একটা জায়গার কথা বলা যেতে পারে, একবার শুটিং করতে গিয়ে ঝড়ের সময় রায়মঙ্গলে দুই বন্ধুতে মিলে রাত কাটিয়েছিলাম। যদি বর্ষায় কারো সুন্দরবন যাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে বলব অতি বড় সাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে। সারেংকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটাতো ডুবে যেতে পারে, বলল, ডুবেতো প্রায়ই যায়। তখন বললাম, সারারাত্রিতো থাকব, লঞ্চতো ডুববে, তাছাড়া আর কী কী হতে পারে? বলল, এমনি কিছুনা, এখানে একরকম সাপ আছে, আমরা বলি ঘামছা...বললাম, সেটা কীরকম? ওই সুড়সুড় করবে, মনে হবে কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে, যেই নড়বেন, একটা সঙ্গে সঙ্গে জিব বের করবে, আপনি মরে যাবেন। তারপর অনেকক্ষণ পরে ঝড়টা যখন শান্ত হল, ভোর হল, আমার বন্ধু, সেই ফিল্মের এডিটর মহাদেব শী বলল, দেখতো ভালো করে আমরা বেঁচে আছি কিনা?

শ্রোতা (দেবাশীষ রায়) - বিপদের কথা হচ্ছে দেখে একটা কথা মনে এল, আমাদের ছুটি ডট কম-এর দুরকম পাঠক আছে, একদল হচ্ছে, দু-তিনমাস আগে থেকে টিকিট-ফিকিট কেটে, বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে, কোথায় গিয়ে নামতে হবে, কে নিয়ে যাবে...এভাবে ভ্রমণ করতে ভালোবাসে, আরেকদল হচ্ছে, ওই বেরিয়ে পড়ল, যেদিকে দুচোখ যায়। দুটোর ক্ষেত্রে দুরকম বিপদ। একটা বিপদতো হচ্ছে অজানা, বিপদ যদি জেনেই যাব, তাহলে বিপদের কোন মাহাত্ম্য নেই। আর যারা ওভাবে প্যাকিং করে যেতে ভালবাসে তাদের কাছে মসকুইটো কয়েল নিয়ে যাব কিনা সেটাও একটা বড় বিপদ। ওখানে গিয়ে ইন্ডিয়ান স্টাইল না কমোড সেটাও একটা বড় বিপদ। আমিই যেমন একটু এদিক-ওদিক চলে যেতে ভালোবাসি, আর আমার গিন্নী চান ওই মসকুইটো কয়েলটাও প্যাক করে নিতে। যদি আমাদের ছুটি ডট কম এমন কিছু পথের সুলুক-সন্ধান দেয়, আমাদের চেনা পথের বাইরে কিছু অফবিট জায়গার তাহলে আমাদের মত মানুষেরা আরও আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

সৌমিত্র - দময়ন্তীর কাছ থেকে সময়টা কেড়ে নিয়েই আমি বলছি, এটা খুব সত্যি কথা। এমনকী কলকাতাতেই এত অজস্র জায়গা আছে - যেমন বেলেঘাটায় যেতে যেতে গ্রীক সেমেটারি যদি দেখেন, এত চমৎকার স্থাপত্য, কলকাতায় খুব একটা নেই। আমি বলছিনা যে শুধু কলকাতাই দেখতে হবে। কিন্তু অনেক শহরে এটা আছে, এভাবে দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা ট্যুরিজম বলতেই বুঝি শুধু চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া, শহীদ মিনার। কলকাতার পুরোনো বাড়িগুলো যদি আপনি দেখতে শুরু করেন, শুধু যদি চিৎপুর রোড ধরে আপনি হাঁটেন... চিত্রসেনের মন্দির থেকে শুরু করে আমাদের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পাশে দেবেন ঠাকুর প্রথম যে ধর্মসমাজ তৈরি করেছিল, যেটা এখন গোডাউন হয়ে গেছে, যে বাড়িতে কেশব সেন জন্মেছিলেন... আমার মনে হয় এগুলোর দরকার এইকারণে, যাঁরা নতুন এলেন তাঁরাতো বটেই, আমরাও যারা কলকাতায় থাকি, কলকাতায় বড় হয়েছি বলে গর্ববোধও করি, আমরা কিন্তু কিছু জানিটানিনা। আমিও দময়ন্তীকে এটা সাজেশন দেব, এটা যদি কোনভাবে লেখা যায়, আমরা ছুটির দিনে যখন বাচ্চা নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাই, কোথায় গ্রীক চার্চ আছে, সেটাও বোধহয় আমরা দেখে আসতে পারি।

◆আপনারা দুজনেই খুব ভালো বললেন। আসলে আমাদের ছুটিতো শুধু আমরা দুতিনজন মিলে করা নয়, চেনা-অচেনা সব বন্ধুরা মিলেই করা। আমাদের এই বন্ধুরাই তথ্য দিচ্ছেন, নতুন জায়গার খবর দিচ্ছেন। এভাবেই আমরা নিশ্চয় আস্তে আস্তে চেনা জায়গার পাশাপাশি নানান অচেনা জায়গার তথ্যে-লেখায়ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠব।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আড্ডা শেষ করছি। খুব ভালো লাগল আপনাদের সবার সাথে কথায়-কথায় এতক্ষণ কাটাতে।

'আমাদের ছুটি'-র ১ম বর্ষপূর্ত্তি উৎসবের আরো ছবি

www.amaderchhuti.com

tell a Friend

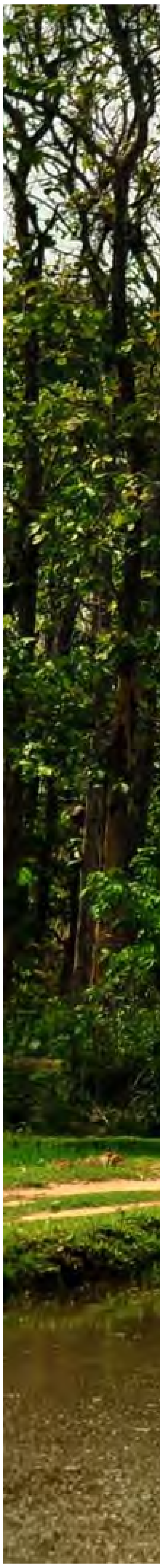

জঙ্গলে-জঙ্গলে সাইকেলে

মহম্মদ শরীফুল ইসলাম

তথ্য - সিলেট

~ সিলেটে সাইকেল অভিযানের আরো ছবি - মহম্মদ শরীফুল ইসলাম - আশফাক হাসান ~

কমলাপুর স্টেশন, ঘড়িতে সাড়ে সাতটার মতো বাজে। আমরা ছ'জন উপস্থিত, অপেক্ষা করছি বাকি ছয় জনের জন্য। পৃথিবী দিবস (Earth Day) উপলক্ষে সেইফ এর আয়োজনে আমরা বারোজন মিলে সাইকেল চালানোর জন্য শ্রীমঙ্গল যাচ্ছি। আমরা অর্থাৎ আমি, নূর ভাই, রাহাত ভাই, ফুয়াদ ভাই আশফাক ভাই, ফয়সাল ভাই, পার্থ ভাই, রাহিন ভাই, সজিব ভাই, নিবির ভাই, শাওন ভাই আর আরাফত ভাই। এছাড়াও এই যাত্রায় সঙ্গে রয়েছে আমাদের সহকারী মাসুম ভাই, গাড়ির ড্রাইভার সোহাগ ভাই ও তার সহকারী। বাকি ছ'জন আসলেই সাইকেলগুলো তুলে দেব পিকআপে। এই ভাবতে ভাবতেই দেখি সাইকেলের সামনে বাতি জ্বালিয়ে সবাই উপস্থিত।

ইতিমধ্যে আমাদের ম্যাকগাইভার নূর ভাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সাইকেলের প্যাডেল খোলা আর হ্যান্ডেল বাঁকা করার জন্য। আমাদের দলে অবশ্য আরেকজন ম্যাকগাইভার ইমরান ভাই ছিলেন, কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। তাতে অবশ্য দেখছি একটু সুবিধাই হয়েছে। দুইজন ম্যাকগাইভার এক সঙ্গে হলে দেখা যেত তাঁরা সাইকেল খুলে বিমান অথবা হেলিকপ্টার জাতীয় কিছু একটা বানিয়ে ফেলেছেন! সবাই সাঙ্গ-পাঙ্গ হিসাবে নূর ভাইকে সাহায্য করে গেলাম। আমরা যে ছোট পিকআপ নিয়েছি সেটাতে সব কয়টা সাইকেল নিতে হলে প্যাডেল খোলা আর হ্যান্ডেল বাঁকা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। পিকআপে সাইকেল তুলে সবকিছু বেঁধে শেষ করতে করতে রাত ন'টা বেজে গেল। এই কাজে আমাদের বিদায় দিতে আসা মহিউদ্দিন ভাই ও শামীম ভাইও সহযোগিতা করলো।

ট্রেন ছাড়ার কথা রাত দশটায়, এই তথ্য শুধু আমি আর রাহাত ভাই জানি, আর কেউ না। সবাই যদি জানতো রাত দশটায় ট্রেন তা হলে কেউ সাড়ে ন'টার আগে কমলাপুরে উপস্থিত হতো না। এর আগে আশফাক ভাইয়ের লঞ্চ মিস করার অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা আছে। সে গল্পটা অবশ্য রাহাত ভাইয়ের কাছেই শুনতে হবে।

ট্রেন চলতে শুরু করলো তখন ঘড়িতে দশটা বেজে পনেরো কী কুড়ি। সবাই মিলে আড্ডা দিতে দিতে এক সময় পৌঁছে গেলাম শায়েস্তাগঞ্জ। স্টেশনের ঘড়িতে তখন রাত তিনটা। পুরোপুরি অন্ধকার স্টেশন, বিদ্যুৎ নেই। একটা হোটেলে ঢুকে জানতে পারলাম বিদ্যুৎ নেই রাত দশটা থেকেই, কখন আসবে তারও কোন ঠিকঠিকানা নেই। খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সকালের আলোর জন্য। প্লাটফর্মে সবাই বসে পড়লাম, কেউ কেউ শুয়েও পড়লো, আর নূর ভাই কয়েকজনকে নিয়ে আকাশের তারা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

www.amaderchhuti.com

সকালের আলো ফুটতেই রওনা দিলাম সাতছড়ির উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সাতছড়ি বনের গেটে। সেখানে সাইকেলগুলো নামিয়ে ঠিকঠাক করে রওনা দিলাম রেমার দিকে। পথে চুনারুঘাটে সকালের নাস্তা খেয়ে নিলাম। লোকজনদের জিজ্ঞেস করে করে আবার রওনা দিলাম। প্রায় ১০/১২ কিলোমিটার যাওয়ার পর পথে ছোট একটা নদী পড়ল। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের আমাদের ছোট নদী কবিতার মতোই। কবিতার নদীর মতো এখানেও অল্প পানি। আমাদের হাঁটু পানির চেয়ে একটু বেশিই তবে ফুয়াদ ভাইয়ের মনে হয় হাঁটু পানিই হবে কারণ তিনি আমাদের সবার চাইতে লম্বা। এই নদীতে গরুর গাড়ি না চললেও আমরা সবাই সাইকেল নিয়ে ঠিকই পার হয়ে গেলাম। তবে সাইকেলে চেপে না, সাইকেল আমাদের কাঁধের উপর চেপে পার হলো।

রেমা ছাড়িয়ে

পার হওয়ার সময় আশফাক ভাইকে বললাম, যে গরম এখানে গোসল করে নিতে পারলে ভালো হতো। নদী পার হয়ে পিছন ফিরে দেখি তিনি এরমধ্যেই হাফ প্যান্ট পড়ে নদীতে শুয়ে পড়েছেন। অল্প সময় বিশ্রাম নিয়ে রওনা দিলাম। এতক্ষণ আমরা পাকা রাস্তা দিয়ে চালাচ্ছিলাম, এখান থেকেই মাটির রাস্তা শুরু হলো। চা বাগানের ভিতরে উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে চলা শুরু করলাম। আঁকা-বাঁকা রাস্তা পার হয়ে একটা জায়গায় এসে থামলাম পানি নেওয়ার জন্য। একটি প্রাইমারী স্কুল চোখে পড়লো - "রেমা চা বাগান কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়"। স্থানীয় একজন লোকের সহযোগিতায় সবার পানির বোতল ভরে নিলাম। কয়েকটা বিস্কিট আর পানি খেয়ে রওনা দিলাম, ঘড়িতে তখন সকাল ১১ টা।

মোটামুটি এক ঘণ্টা চালানোর পর হঠাৎ ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। ফয়সাল ভাইয়ের সাইকেলের পেছনের চেনের দিকে একটা প্রমাণ সাইজের ডাল ঢুকে গেল। রাহাত ভাই অনেক দোয়া-দুরুদ পড়ে সেই ডালটি বের করতে সক্ষম হলেন। দোয়া-দুরুদ পড়ার কারণ ডালটা এমনভাবে ঢুকেছিল যে বেশি টানাটানি করলে ডিরুইলারটাই ভেঙ্গে যেতে পারত।

আরো প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার আসার পর দেখি ফুয়াদ ভাই আর পার্থ দাঁড়িয়ে। কী ব্যাপার? দেখলাম আগের বার বেঁচে গেলেও এবার অঘটনটা পুরোপুরিই ঘটেছে। রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের একটা ডালের বাড়ি খেয়ে ভেঙ্গে গেছে ফুয়াদ ভাইয়ের সাইকেলের ডিরুইলার। আমার ৪/৫ বছর সাইক্লিং জীবনে এটা দ্বিতীয় ডিরুইলার ভাঙ্গার ঘটনা। নূর ভাই আর আমি কোনরকমে চেইন কেটে ছোট করে ফিক্সড করে দিলাম। যেকোনভাবে এই জঙ্গল পার হতে পারলে শান্তি।

সাইকেল চালাচ্ছি তো চালাচ্ছি... আশে-পাশে কোন জনবসতি নেই। প্রচণ্ড গরম, অনেকের বোতলের পানি শেষ, আশফাক ভাই এরই মধ্যে ছড়া থেকে পানি নিয়ে খেয়ে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ পর পরই টিলা উঠা-নামা করতে হচ্ছে। পথে গাছ ভেঙ্গে পড়ে আছে, শুকনা ডাল দেখে খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল ঠেলে উঠতে হচ্ছে। দুপুর ২ টার দিকে পৌঁছে গেলাম রেমা বিট অফিস।

এখান থেকে শ্রীমঙ্গল দুই আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। সবাই আরাম করে অফিসের টিউবয়েল থেকে পানি নিয়ে নিল। কেউ কেউ কলের নিচে বসে গোসলও করে নিল। হালকা খাওয়া-দাওয়া করে অনেক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমার রওনা দিলাম। ঘণ্টা খানেক চালানোর পর রাস্তার দেখা পেলাম। ফোনে গাড়ির ড্রাইভারকে চলে আসতে বলে দিলাম। গাড়ি আসার পর ফুয়াদ ভাইয়ের সাইকেল তুলে দেওয়া হলো। আশফাক ভাই, রাহাত ভাই, ফয়সাল ভাই, রাহিন ভাইসহ কয়েকজন গাড়িতে করেই শ্রীমঙ্গলের পথে রওনা দিল। আর আমরা হার না মানা কয়েকজন সাইকেল চালাতে শুরু করলাম। বিকালেই পৌঁছে গেলাম শ্রীমঙ্গল শহরে। কুটুমবাড়ি নামে এক রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম সবাই। খাওয়ার পর রাতে থাকার জন্য রওনা দিলাম শ্রীমঙ্গলের বিখ্যাত বি.টি.আর.আই. টি.-রিসর্টে। রিসর্টে পৌঁছে কোনরকমে ব্যাগ রেখে সুইমিং পুলে লাফ দিলাম। অনেক্ষণ দাপাদাপি করে রুমে ফিরে এসে ঘুম। সকালে উঠতে উঠতে ৮ টা। কয়েকজনতো ৯ টার দিকে উঠলো। ঘুম থেকে উঠেই আবার সুইমিং পুলে দাপা-দাপি শুরু করলো সবাই। সকালের নাস্তা খেয়ে রওনা দিলাম লাউয়াছড়া বনের দিকে।

বনের গেটে এসে ডাব, আনারস, তরমুজ খেয়ে বনের ভেতরে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ ট্যুরিস্টদের ফেলে আসা ময়লা পরিষ্কার করে আবার সাইকেল চালানো শুরু করলাম। আমাদের কাছ থেকে থেকেই বিদায় নিলেন সজিব ভাই আর নিবির ভাই। তাঁদের পরের দিন অফিস আছে তাই ঢাকায় ফিরতে হবে। লাউয়াছড়ার জঙ্গলে ঢুকে আমার আর শাওন ভাইকে জোঁকের কামড় খেতে হলো। আমাদের জোঁকের কামড় খাওয়া দেখে সবাই যে যার হাত-পা দেখে নিলেন। জঙ্গল থেকে ভুল রাস্তা

কালেঙ্গা

ধরে বের হয়ে এক চা বাগানে এসে থামলাম। যাই হোক লোকজনদের জিজ্ঞেস করে আমরা এক গ্যাসফিল্ডের পাস দিয়ে শহরে যাওয়ার রাস্তা পেলাম।

রাস্তা অবশ্য পুরোপুরি পাকা না, কিছুটা মাটির। পার্থ ভাই মুখ গোমড়া করে সবার সামনে চালান আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন। প্রথমে কারণটা বুঝতে পারছিলামনা, তারপর ফুয়াদভাই বুঝিয়ে দিলেন যে আমরাতো একটু আস্তে সাইকেল চালাচ্ছি তাই পার্থভাইয়ের মন খারাপ। কারণ তিনি সব সময় জোরে সাইকেল চালিয়ে থাকেন। ইদানীং আইরন ম্যান হওয়ার ট্রেনিং নিচ্ছেন তাই তাঁকে কিছুক্ষণ পর পর খুঁজে পাওয়া যায় না!

একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে রওনা দেওয়া হলো। ৪ টার দিকে আমরা আবার শ্রীমঙ্গল পৌঁছে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি সজিব ভাই আর নিবির ভাই এখনো ঢাকায় যাননি। তাঁদের ট্রেন ছাড়ার সময় পিছিয়েছে। এবং তাঁরা এরই মধ্যে সিদ্ধান্তও নিয়েছেন যে আমাদের একা একা আনন্দ করতে দিবেন না এবং তাঁরা ঢাকা যাবেন না। তবে আশফাক ভাই ঘোষণা করলেন তিনি চলে যাবেন। হোটেলে উঠে সবাই ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে আসলাম বাইরে ঘোরাঘুরি ও রাতের খাওয়ার জন্য। আমাদের হোটেলের পাশেই একটি সিনেমা হল চোখে পড়লো। সেখানে যে ছবি চলছে সেই ছবির পোষ্টার দেখে কয়েকজনের বেশ ভালই আগ্রহ তৈরি হয়ে গেলো। ছবির নাম 'শিকারি'। আমাদের সেই কুটুমবাড়িতে রাতের খাওয়া শেষ করে ফেরার সময় ফুয়াদ ভাই ঘোষণা করলেন তাঁর ছোট বেলার, "ঐ দেখা যায় তাল গাছ/ ঐ আমাদের গাঁ" এই কবিতাটি হঠাৎ মনে পরে গেছে। হঠাৎ এই কবিতা মনে পরার রহস্যটা একটু ইন্টারেস্টিং। তবে সেটা আপাতত রহস্যই থাক।

সকালে শ্রীমঙ্গল শহর থেকে বের হয়ে লাউয়াছড়া রাস্তার দিকে রওনা হয়েছি, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। লাউয়াছড়ার গেটের আগে ডানদিকে একটি রাস্তা চলে গেছে মাধবপুর লেকের দিকে। কিছুদূর যাওয়ার পরই হঠাৎ করে আমার সামনে সজিব ভাই সাইকেল নিয়ে উল্টে পড়ে গেলেন। কারণ তিনি রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে বালু ছিলো, সেই বালুতে স্লিপ করে পড়ে গেছেন। হাত কনুইয়ের দিকে ছিলে গেছে এবং আঙ্গুলে বেশ ভালই ব্যথা পেয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমঙ্গলে থাকা আমাদের পিকআপের ড্রাইভার সোহাগ ভাইকে ফোন করলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। এর মধ্যে নূর ভাই সজিব ভাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দিয়েছেন। সজিব ভাইকে গাড়িতে তুলে আমরা রওনা দিলাম মাধবপুর লেকের উদ্দেশ্যে। প্রায় ৪০ মিনিট সাইকেল চালানোর পরেই পৌঁছে গেলাম লেকে। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে রওনা দিলাম শহীদ বীর শ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান সমাধিস্থল দেখতে। শহীদ বীর শ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার খোরদা খালিশপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব অক্কাশ আলী একজন দরিদ্র কৃষক এবং মাতা গৃহিনী কায়সুননেসা। তিনি ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ধলই সীমান্ত চৌকিতে যুদ্ধে নিহত হন। সেখানে কিছু ছবি তুলে আমরা রওনা দিলাম শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পাশ দিয়ে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম শহরে। সাইকেল গাড়িতে তুলে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম ট্রেন আসার জন্য।

লাউয়াছড়া

শ্রীমঙ্গল

www.amaderchhuti.com

সময়ের অভাবে আমাদের "শিকারী' ছবিটা আর দেখা হলো না!

বিপদেআপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই 'সেইফ' (Safety Assistance For Emergencies) -এর প্রধান কাজ। এর বাইরেও সেইফের নিয়মিত কর্মী শরিফুলের জীবনের আরেক নাম ভ্রমণ। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, নৌকায় এযাবত নানান অভিযানে অংশ নিয়েছেন তিনি। এরমধ্যে সাইকেলে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা ভ্রমণ, পায়ে হেঁটে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ, সাইকেলে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সময় পেলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভ্রমণের পাতায় লেখেন সেইসব অভিজ্ঞতার কথা।

Rate This : - select -
Total Votes : 19
Average : 3.16

Like 14 people like this. Be the first of your friends. tell a Friend

Post Comments

Shorif vai, Valo hoyeche likha ta.. Abar kobe jaben?

- Mohiuddin [2012-09-11]

Bangladesh Forest Department and SAFE(Safety Assistance For Emergencies) in association with other stakeholders will jointly organize â€œForest to Forest Mountain Bike Challenge 1â€ in between Rema & Kalenga forest - Plz check link - trail.https://www.facebook.com/events/101668086657823/?notif_t=plan_user_joined

- khandakar.rahman [2012-09-11]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

www.amaderchhuti.com

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বকখালি ভ্রমণ ও একটি রচনা লেখার গল্প

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ তথ্য- বকখালি ‖ বকখালির আরো ছবি - শিবাজী কুণ্ডু ~

গোপালের ভ্যানরিক্সায় সওয়ারি আমরা তিনজন। এখনো রোদ ওঠেনি তেমন... অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। বকখালি গ্রামের মধ্যে দিয়ে ইঁটের রাস্তা ধরে লাফাতে লাফাতে ভ্যানটা চলেছে। রাস্তার দু'পাশে মাটির বাড়ি - বনতুলসীর বেড়া দেওয়া। নিকোনো উঠোনে বিছানো রয়েছে মাছধরার জাল। উঠোনের ধারে লাল জবা আর কল্কে গাছে সাদা-হলুদ ফুল ফুটে রয়েছে। আর ওদের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে নারকেল গাছগুলো। রাস্তা কোথাও কোথাও এতটাই ভেঙ্গে গেছে যে নেমে পড়তে হচ্ছে ভ্যানরিক্সা থেকে।আরও কিছুটা এগোতেই পথের পাশে একের পর এক মাছের ভেড়ি চোখে পড়ছিল। চেনাগাছগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে অচেনা ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে। গোপালের কাছে বনের পাঠ নিই - চিনতে চিনতে চলি হেঁতাল, গরান, বানি, গেঁও, গামা, বের বাবলাদের। গরান আর হেঁতালের ঝোপের পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বের বাবলা। এর চেহারা অনেকটা সুন্দরীর মতো। হেঁতালের স্থানীয় নাম 'বকরা' - যার থেকে উৎপত্তি বকখালি নামের। ছোট্ট ছোট্ট ফলেভরা বো-এর কুলগাছ। পথের ধারে লাল ভ্যারেন্ডা আর মনসার ঝোপ।ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ফাঁকে কোথাওবা উঁকি মারছে চেনা নিম আর খেজুর গাছ। ইঁটের পথ শেষ হয়ে মাটির আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে এগোয় ভ্যান। এইপথেই আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে কিরণ সৈকত, আমরা অবশ্য অতটা যাবনা। ভ্যান থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই জলের ধারে।

www.amaderchhuti.com

গঙ্গা- ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের একটা বড় অংশ হেনরি আইল্যান্ড। নামকরণ হয়েছিল এক ব্রিটিশ সার্ভেয়ারের নামে। সুন্দরবনের পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্রের তীরে ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া এই এলাকায় অনেকদিন আগে নাকি বাঘের দেখাও পাওয়া যেত। নদী আর তাদের শাখানদীরা জলের জাল বুনেছে এই ভূমিতে। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য দপ্তর সমুদ্র লাগোয়া এই অঞ্চলটিকে ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে তোলে। ভ্যানরিক্সায় আসতে আসতেই ফিসারিজ-এর ট্যুরিস্ট বাংলো চোখে পড়েছিল।

জল-জঙ্গলের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে গোপালের অথবা গোপালদের গল্প শুনি। ওই যে মাটির বাড়িগুলো পথে দেখতে দেখতে এলাম ওরকমই কোন মাটির দাওয়ায় হয়তো এখন মাছ ধরার জাল শুকাচ্ছে গোপালের বউ আর তার বুড়ি মা, উঠোনে খেলে বেড়াচ্ছে গোপালের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আরেকটু বড় হলে মেয়ে হাত লাগাবে মায়ের সঙ্গে আর ছেলে জাল নিয়ে বাপের মতোই নেমে পড়বে সমুদ্রে অথবা শিখে নেবে ভ্যান চালানোর কাজ।

কী যেন ভাবছিলাম...মনটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ গোপালের ডাকে সম্বিত ফিরে দেখি কখন জঙ্গলে ঢুকে ভেঙ্গে এনেছে ঝলমলে হলুদ ফুলে ভরা একটা ল্যাটা গাছের ডাল, বনঝাউয়ের ডালের টুকরো আর গরানের ফলের ঝাড়। গাছগুলো ভাঙ্গার কথা বারণ করতে গিয়েও থেমে গেলাম...ফুলগুলোর মতোই ঝলমল করছে ওর হাসিভরা দু'চোখ। এই প্রকৃতির ও অনেক কাছের মানুষ। হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করি প্রকৃতির উপহার। এবার ফিরতে হবে।

এটা প্রায় বছর ছয়েক আগের গল্প। মেয়ে তখন অনেকটাই ছোট। গরমের ছুটিতে ওর হোমওয়ার্ক ছিল গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সেই বর্ণনা লিখে ফেলা। ওকে নিয়ে এটাই মুশকিল যে রচনা জিনিসটা যে বানিয়ে লিখতে হয় সেটা কিছুতেই মানবেনা। স্কুল থেকে ফিরেই বলল, আমাকে হয় কোন গ্রামে বেড়াতে নিয়ে চল, নইলে আমি ওই রচনা লিখছিনা। কী ঝামেলারে বাবা...কে যাবে এই ঘোর গরমে বাংলার গ্রামে! সমাধান করল দীপ। একটা রবিবার ভোরে ভূতল নিগমের বাসে উঠে পড়ি তিনজনে। গন্তব্য কাকদ্বীপ, নামখানা পেরিয়ে বকখালি। পথে কলকাতায় জন্ম ইস্তক বড় হওয়া আমাদের সাতবছরের মেয়েকে দেখাতে দেখাতে চলি খড়, টিন, টালিতে ছাওয়া মাটির বাড়ি, উঠোনে খেলে বেড়ানো মুরগীর বাচ্চা, কলাগাছ, পুকুর, ধানক্ষেত, মফস্বলের বাজার...।

গাড়ি পৌঁছালো নামখানা। এখানেই বার্জে চড়ে পেরোতে হবে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী। শুধু আমরাই নই, আস্ত বাসটাই অন্য আরও গাড়ির সঙ্গে উঠে যাবে লঞ্চে! প্রথমবার এই অভিজ্ঞতায় কে বেশি উত্তেজিত আমি না আমার মেয়ে তা বলা বেশ কঠিন। পরে আন্দামান বেড়াতে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতা একাধিকবার হয়েছিল কিন্তু প্রথমবারের মতো অমন উত্তেজনা আর কখনো হয়নি।

সরকারি ট্যুরিস্ট লজটা সমুদ্রের বেশ কাছে। তবে প্রায় ঢোকার পরপরই বিপত্তি - কোথা থেকে একটা গোদা বাঁদর এসে টেবিল থেকে আমার সাইড ব্যাগটাই তুলে

নিচ্ছিল। অনেক কষ্টে তার হাত থেকে ওটা উদ্ধার করা হল। সে আরেক গল্প।

বকখালির সমুদ্র একটু ভেতরে। স্নানের জন্য বেশ ভালো। প্রশস্ত সৈকতে হাঁটতে বা বসে থাকতেও বেশ ভালোলাগে। সমুদ্রের ধারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলা টানা বসার জায়গাও রয়েছে। তবে সেইসময় রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে সমুদ্রের তীরে যা জঞ্জালের স্তূপ দেখেছিলাম সেটা খুব বিশ্রী লেগেছিল। স্নান করে উঠে সবচেয়ে ভালোলাগে সমুদ্রের ধারের ঝুপড়ি হোটেলগুলোর ডালভাত, মাছতরকারির স্বাদ - খিদের মুখে একেবারে অমৃত। বিকেলবেলায় সৈকতের কাছের ঝুপড়ি চায়ের দোকানগুলোয় বসে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া আর গরম চা দুটোই দারুণ। মেঘ সরলে রাতের সমুদ্র জ্যোৎস্নায় ভাসে... হু হু হাওয়া উড়িয়ে দেয় চুল।

সোমবার সকালে হেনরী আইল্যান্ড আর বনবিভাগের কুমির প্রকল্প ঘুরে আসার পর দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের গন্তব্য ফ্রেজারগঞ্জ আর বেনফিসের ফিসিং হারবার। দূর থেকেই বড় বড় উইন্ডমিলগুলো স্বাগত জানায়। সমুদ্রতটের ঠিক আগেই আগাছা আর জঙ্গলে ঘেরা সাহেবী আমলের বাংলো টাইপের কয়েকটা ভাঙ্গা বাড়ি। এরই আশেপাশে কোথাও বাংলার একসময়ের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বাংলোবাড়িটি ছিল, কালের অতলে যা হারিয়ে গেছে সমুদ্রগর্ভে। ফ্রেজার সাহেবের নাম থেকেই এই জায়গার নাম হয়েছিল ফ্রেজারগঞ্জ। সন্ধ্যের মুখে যখন ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রতটে পৌঁছালাম তখন নির্জন সৈকতে শুধু হু হু করে হাওয়া বইছে আর একাকী দাঁড়িয়ে আছে মাছধরার একটা নৌকো। অন্ধকার নামার আগেই পৌঁছাতে হবে বেনফিসের হারবারে, আবার ভ্যানে উঠে বসি।

জলের মধ্যে সারসার দাঁড়িয়ে আছে মাছধরার নৌকা। কেউবা ফিরে এসেছে একটু আগেই, কারোরবা চলছে কাল সকালে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি। আঁশটে গন্ধে হারবারের বাতাসটা ভারি হয়ে আছে। এখান থেকে ছোট নৌকো ভাড়া নিয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে জম্বু দ্বীপ থেকেও বেড়িয়ে আসা যায়। হারবারের দুপাশে বানিগাছের জঙ্গল। মাটির মধ্যে থেকে উঁকি মারছে ম্যানগ্রোভের অজস্র শ্বাসমূল।

www.amaderchhuti.com

হারবারের নীচে সিমেন্টের থামের গায়ে মরা সামুদ্রিক পোকা জমে তৈরী হয়েছে প্রকৃতির কারুকার্য। ভ্যানচালক বললেন এইগুলো ভেঙ্গে নিয়ে তৈরি করা হয় চুন। সত্যি কতরকম জীবিকায় বেঁচে থাকার লড়াই করে মানুষ, আর কতরকমভাবেইনা হাত বাড়িয়ে দেয় প্রকৃতি।

পরদিন ফেরার পথে বাসে বসে টুকরো টুকরো ভ্রমণস্মৃতি ফিরে ফিরে আসছিল। মনে হল আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার রাস্তাঘাট আর ঝাঁ চকচকে হোটেলের সারির মাঝে কোথাও যেন লেগে আছে একটা অবহেলার সুর। নোংরা জমে থাকা বেলাভূমিতে, হেনরি আইল্যান্ডে যাওয়ার ভাঙ্গা রাস্তায়, ঝুপড়ি দোকান আর নীচু নীচু মাটির বাড়িতে কিম্বা ফ্রেজারগঞ্জের আগাছা ঢাকা ভাঙ্গা বাংলোবাড়িগুলো আর গোপাল দাসদের কণ্ঠস্বরে পাওয়া যায় সেই বেদনার আভাস।

~ তথ্য- বকখালি ‖ বকখালির আরো ছবি - শিবাজী কুণ্ডু ~

'আমাদের ছুটি'-র সম্পাদক দময়ন্তী কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন দৈনিক 'কালান্তর', 'স্বর্ণাক্ষর' ও 'আজকাল' প্রকাশনার সঙ্গে। পাশাপাশি দীর্ঘ দিন ধরে মুক্ত সাংবাদিকতা করছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ভালোবাসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, বই পড়তে, ভ্রমণকাহিনি ও ছোটগল্প লিখতে, বেড়াতে আর 'আমাদের ছুটি' কে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে।

Rate This : - select -
Total Votes : 26
Average : 4.27

Like 9 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

Post Comments

ধন্যবাদ প্রদীপ্ত

- দময়ন্তী [2012-09-27]

Chokher samne Aktukro bokhali , bhison sondor.

www.amaderchhuti.com

- pradipta [2012-09-26]

ধন্যবাদ সুপ্রিয়। তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে বর্তমানে ভ্রমণ লেখা বড় বেশি পণ্য সাহিত্যের দিকে চলে যাচ্ছে। একটু চেষ্টা করেছি ছোটগল্পের আঙ্গিকে মূল ধারার ভ্রমণসাহিত্যে ফিরে আসার।

- দময়ন্তী [2012-09-15]

lekhar badhon asadharan,cokher samne puro chabitai uthe eseche,ar ektu besi hole bhalo hoto,anekta choto galpo hoye gache,ses hoyeo hoilona sesh.Khideta mitlo na.

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কুয়াশাঘেরা হ্রদ-পাহাড়ের উপকথা

বিপ্লব রহমান

বগালেকের তথ্য

দুর্গম পাহাড়ে ডিসেম্বরের ভোরে হিম বাতাসের কামড় ছাপিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করা কুয়াশা নয়, নারকেল দুধের মতো ঘন সাদাটে ধোঁয়াশা। শীতলতায় হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চায়, ঘোলাটে চশমার কাঁচ বাস্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে, তখন হাত তিনেক দূরের দৃষ্টিও বুঝি অসাড়। কুয়াশা জমে জমে বৃষ্টির মতো টুপটাপ ঝরে পড়ে জলকণা অরণ্য সবুজের মগডাল থেকে। ভিজিয়ে দেয় পোষাক-আশাক,ব্যাগ-ব্যাগেজ,সর্বস্ব। দূরে রাতজাগা কোনো পাখি কর্কশ স্বরে ডেকে বলে, হুঁশিয়ার!

এরই মধ্যে রেস্ট হাউজ নামক বাঁশের তৈরি মাচাং ঘর থেকে গুটি গুটি পায়ে একাই বেরিয়ে পড়া। হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ, গেরিলা কায়দায় 'রেকি' করা চারপাশ, ক্ষীণ আশা - সকালের আলোয় বগালেকের অপার বিস্ময় যদি খানিকটা ধরা পড়ে! কিন্তু টর্চের আলো ফ্যাকাশে বলে ভ্রম হয়, তখনো সকালের আলো ফোটেনি। চারপাশের চাপ চাপ ধোঁয়াশার বিস্তার দেয়ালসম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। চামড়ার পুরনো জ্যাকেট, আর কোমড় তাঁতে বোনা চাকমা সুতি মাফলারে শীত তাড়ানোর অবিরাম কসরতের অংশ হিসেবে একটি সিগারেট ধরানো। তাতে ধোঁয়াশা আরেকটু বাড়ে বৈকি, শীতের দাপটে রক্ত জমে আসতে চায়। আবারো ফিরে আসা এক কামরার মাচাং ঘরের ওমের ভেতর।

www.amaderchhuti.com

সহ-সাংবাদিক বুদ্ধজ্যোতি চাকমা তখনো মাচাং ঘরের দ্বিতীয় সিঙ্গেল খাটে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমের ঘোরেই অস্ফুট স্বরে নির্দেশ পাওয়া যায় শুয়ে পড়ার। আরেক সিঙ্গেল খাটে বম কম্বলে প্যাকেটজাত ও আধ শোয়া হয়ে খাটের নীচ থেকে টেনে নেওয়া ছোট্ট পানীয়ের বোতল, কড়া স্বাদের মারমা লিকারটির নাম - প্রাইং। শীত ও ক্লান্তি নিবারণে বিন্নি ভাতের এই চোলাইটির কার্যকারিতা বিস্ময়কর। কয়েক চুমুক পান করার পর বুদ্ধ তার খাট থেকেই হাত বাড়ায় বোতলটির দিকে, দু-এক টানেই শূন্য করে ফেলে। টর্চের লালচে আলোয় ক্রেওকাডং শিখর জয়ের পরিকল্পনা করা হয়। তার আগে বগালেক তো অবশ্যই...

লোকালয় বিচ্ছিন্ন বান্দরবানের রুমার দূর বগালেকের পাড়ের রেস্ট হাউজ কাম মাচাং ঘরটি প্রাচীন কোনো গুহা বলে ভ্রম হয়। যেন পথহারা দুই পর্বত অভিযাত্রী অবিরাম পরিকল্পনা করে চলেছে উদ্ধারের আশায়। বন মোরগের ঝাঁক প্রাতরাশ সারতে বেরিয়ে তীব্র চিৎকারে ডাকে বার বার। দ্বিপাক্ষীয় আলোচনা দ্রব্যগুণের প্রলাপে ছেদ পড়ে।

এমনি করে সকাল খানিকটা চড়লে নয়টা নাগাদ দেখা মেলে সুর্যদেবের। আউট অব ফোকাস থেকে আস্তে আস্তে দৃষ্টি গোচর হতে থাকে লেকপাড়ের বম পাড়া। আড়মোড়া ভেঙে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া। জগের পানিতে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মাইনস-সিক্স-বাইফোকাল চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আর বাক্য সরে না। সামনে হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন নীলাভ রঙা সুবিশাল এক প্রাকৃতিক জলাশয়- বগালেক! অশেষ অপার বিস্ময়ের বগালেক!

এই লেক, লেক ঘেরা সবুজ পাহাড়ের দেয়াল, বম পাড়া - সবই বুদ্ধর খুব চেনা। তবু একান্ত মুগ্ধতাটুকু ওকেও স্পর্শ করে আরেকবার।

অলিম্পাস অটো-জুম ক্যামেরার শাটার টিপে ঝটপট তোলা হয় একের পর এক ছবি। তখনো কুয়াশায় মোড়া হ্রদের দূর পাড়ে যেন সাদা রহস্য-ঝাঁক উড়ে যায়। বুদ্ধ বলে, ওগুলো নিছক কুয়াশা নয়, বিশাল এক সাদা বকের দল। লেকে মাছ শিকারে নেমেছে।

এরপর লেকপাড়ের বড় বড় পাথরের বোল্ডারের একটি দখল করে বসা।পায়ের নীচে বরফ শীতল স্বচ্ছ পানিতে ভাসতে থাকে থোকা থোকা লাল শাপলা-শালুক। সেখানে ঘাই মারে ট্যাংরা-পুঁটির ঝাঁক। বুদ্ধ কোথা থেকে একটি বাঁশের কঞ্চি নিয়ে শাপলা-শালুক লতা টেনে নেয়। বলে,আমরা আজ সকালে খানিকটা সিঁদোল শুটকি দিয়ে এই লতার ঝোলের সঙ্গে গরম ভাত খাবো। সঙ্গে থাকবে কচি লেবুর পাতা। তারপর বম গ্রাম প্রধান সাংলিয়ান কারবারিকে গাইড বানিয়ে উঠে যাবো ক্রেওক্রাডং-এর চূড়ায়।

আরো পরে সকালের আহার শেষে ক্রেওক্রাডং-এর দীর্ঘ পথযাত্রায় একের পর এক চড়াই-উতরাই, গিরিখাদ, ঝরনা ও ঝিরি পেরোতে পেরোতে সাংলিয়ান দা'র কাছে শোনা হবে বগালেক নিয়ে প্রাচীন এক বম উপকথা।

যাত্রা বিরতি হয়, নাম বিস্মৃত একটি ছরার পাশে। শীতলতর অবাক জলপানের পর ভূপতিত মৃত গাছের গুঁড়ির ওপর বসলে কারবারি দা' খুলে বসবেন মালাকাইটের ঝাঁপি। ...

বম ভাষায় বগা লেক হচ্ছে-- বগা রেলি। 'বগা' মানে অজগর, আর 'রেলি' হচ্ছে লেক। লেকের উত্তরে বাস ছিলো এক ম্রো পাড়ার। সেটি ব্রিটিশ আমলেরও আগের কথা।

একবার ম্রো' শিকারিরা পর্বতের গুহা থেকে বিশাল এক অজগর সাপ জ্যান্ত ধরে ফেলে। পাড়ার সবচেয়ে বুড়ো লোকটি অনুরোধ জানান, সাপটিকে যেন অবিলম্বে আবার বনে ছেড়ে দেওয়া হয়; কারণ এটি কোনো সাধারণ অজগর নয়, এটি হচ্ছে পাহাড় দেবতা। বুড়োর কথায় কেউ কান দেয় না।

ওই রাতে সবাই মিলে গ্রামের উঠোনে জ্বালে বড়সড় এক অগ্নিকুণ্ড। তারা সাপটিকে আগুনে ঝলসে মহা আনন্দে মদ দিয়ে খায়। সুস্বাদু সাপের মাংসর ভাগ পায় গ্রামের সকলেই। কেবল সেই বুড়ো লোকটি সাপের মাংস ছুঁয়েও দেখেন না। সেদিনই ভোর রাতে বিরাট এক পাহাড়ি ঢল নেমে আসে ম্রো গ্রাম জুড়ে। পানির তোড়ে ভেসে যায় পুরো গ্রামটি, অজগর-পাহাড় দেবতার অভিশাপে মারা পড়ে সবাই। কিন্তু অলৌকিক আশীর্বাদে বেঁচে যান একমাত্র সেই বুড়ো লোকটি। অজগর-অভিশপ্ত ওই পানির ঢল থেকেই বগালেকটির সৃষ্টি। এখনো নাকি সেই ম্রো বুড়োর ভিটে আর অজগরটির গুহা অবিকল টিকে আছে...।

www.amaderchhuti.com

বগালেকের তথ্য

বিপ্লব পেশায় সাংবাদিক আর নেশায় ব্লগার। বাংলাদেশের আদিবাসী জনজীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে প্রায় দুই দশক ধরে লেখালেখি করছেন।

tell a Friend

তবু অনন্ত জাগে...

হিমালয় ভ্রমণ - সেকাল একাল

বিভাস দে

~ তথ্য - গাড়োয়াল হিমালয় ~ গাড়োয়াল হিমালয়ের ছবি ~

কমলানন্দজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হৃষিকেশের স্বর্গাশ্রমে, সেই ১৯৮৪ সালে, আমার প্রথম কেদারে যাবার সময়। গেরুয়াধারী সদালাপী সাধু, জটাজুটের বদলে মুণ্ডিত মস্তক ও মুখমণ্ডল, নিজের হাতে হরিণদের জন্য খাবার ছড়াতে ছড়াতে বলেছিলেন -'হিমালয়ে তু কেদারম্'। অচেনা গন্ধ পেয়ে হরিণদের দল কাছে আসে না, লতাপাতার আড়াল থেকে উঁকি দেয়। বছর ২৫ আগেও স্বর্গাশ্রমের পথে অনেক হরিণ ও ময়ূরের দেখা মিলত। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন-'কেদার কা মার্গ বহুত পুরানা, ফির ভি নয়া জৈসা। কোই তকলিফ নেহি হোগা, ডর ভি নেহি। আরাম সে আগে বাড়িয়ে, ফির তুম লোগোকো আনাহি পড়েগা'। এসেছি বারে বারে, বছরের বিভিন্ন ঋতুতে, কখনো একা, কখনো বা সনাতন ভারতের তীর্থযাত্রী স্রোতে ভেসে। কেন আসি, কিসের খোঁজে, জানি না, কি পাই তারও হিসেব করিনি কখনো। তবে না এসে পারি না। ফিরে যাই চোখে তৃষ্ণা আর হৃদয়ে একরাশ প্রশান্তি নিয়ে।

দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ কেদারনাথের পথে যাত্রী চলাচল সেই আবহমান কাল থেকে। ১৮৮৬ সালের আগে হরিদ্বার হয়ে গাড়োয়াল কিংবা পাঠানকোট হয়ে হিমাচল পর্যন্ত যাওয়াটাই ছিল ভয়াবহ এবং খরচ ও সময় সাপেক্ষ। সুদূর কলকাতা থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাশী পর্যন্ত নৌকাযোগে গিয়ে সেখান থেকে অমৃতসর ডাকের গাড়িতে যেতেন। পরে কালকা থেকে ঝাঁপানে চড়ে হিমাচলে প্রবেশ, তিনি অবশ্য উত্তরাখণ্ডের যাত্রী ছিলেন না। বিশিষ্ট ভ্রামণিক যদুনাথ সর্বাধিকারী কৃষ্ণনগর থেকে উত্তরাপথে পর্যটন করেছিলেন ১৮৫৮ সালে নদীপথে এবং পদব্রজে। ১৮৮০ সালে দূর্গাচরণ রায় গঙ্গানদীর উজান বেয়ে হরিদ্বার পর্যন্ত এসেছিলেন যার বর্ণনা 'দেবগণের মর্তে আগমন' বইয়ে পাওয়া যায়। ১৮৮৬ সালে কোম্পানীর রেলগাড়ি সাহারানপুর ছাড়িয়ে হরিদ্বারে এসে পৌঁছায় এবং সেই থেকে উত্তরাখণ্ডের পথে বাঙালি যাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সেকালে যখন বাসের রাস্তা হয় নি, কেদারযাত্রীরা হাঁটা শুরু করতেন হৃষীকেশের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করে। গঙ্গার বাম তীর ধরে রুদ্রপ্রয়াগ ১৪০ কিমি। সেখানে দড়ির ঝুলায় অলকানন্দা পার হয়ে বামদিকে মন্দাকিনীর উপত্যকায় প্রবেশ। তারপর সুরনদী মন্দাকিনীর বাম তীর ধরে গুপ্তকাশী আরও ৩৫ কিমি।গুপ্তকাশী থেকে নালাচটি-উখিমঠ-ফাটা-শোনপ্রয়াগ-গৌরীকুন্ড হয়ে কেদারনাথ ৫৫ কিমি। সেদিনের সেই ২৩০ কিমি দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগতো ১৪/১৫ দিন। পথে ঘোড়া, ডান্ডি কিংবা কান্ডি পাওয়া গেলেও ১৯২৮ সালে উমাপ্রসাদ হরিদ্বার থেকে কেদারনাথের সমগ্র পথটা গিয়েছিলেন পদব্রজে, ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে। আর এখন হরিদ্বার বা হৃষীকেশ থেকে সকাল সকাল রওনা দিলে সন্ধ্যের আগেই গৌরীকুণ্ড। আজকের ব্যস্ত যাত্রী, পথে জলখাবার খেতে গাড়ি থেকে নেমে দেবপ্রয়াগে দূর থেকে প্রয়াগ দর্শন করেন কিংবা মধ্যাহ্নভোজের অবকাশে নিতান্তই উৎসাহী হলে রুদ্রপ্রয়াগে সিঁড়ি ভেঙে সঙ্গমে নামেন এবং অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর মিলিত ধারাকে আঁজলা ভরে নিয়ে গায়ে মাথায় ছিটিয়ে নেন। তা কেদারের পথে যেতে সে যুগের যাত্রীরা প্রথম বাধা পেতেন হৃষীকেশের গঙ্গা পারাপার হতে। কোন পুল ছিল না, দড়ির ঝুলায় প্রাণ হাতে করে গঙ্গার প্রচণ্ড ধারা পার হতে হত। যদুনাথ সর্বাধিকারীর (১৮০৫-১৮৭১) 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থে এর একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনটে শক্ত দড়ি পাহাড়ের এপার থেকে অন্যপারে দুটো বড়ো গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকত। দেড় হাত চওড়া সেই দড়ি তিনটের উপর আধ হাত অন্তর অন্তর কাঠের টুকরো মই-এর মত বাঁধা থাকত। ফুট তিনেক উঁচু দুপাশের আরও দুটো দড়ি ধরে কাঠের টুকরো গুলোতে পা ফেলে ফেলে অতি সাবধানে গঙ্গা পার হতে হত। ঝুলার দুই প্রান্ত পাহাড়ের উঁচুতে বাঁধা থাকলেও মানুষের ও তার নিজের ভারে মাঝখানটা জলের কাছে নেমে আসত। জলের প্রচণ্ড শব্দ, উত্তাল স্রোত এবং ঝুলার মাঝখানের আন্দোলনে সেকালের যাত্রীদের অবস্থা হত -'ত্রাহি মধুসূদন'। কত না যাত্রী লছমনঝুলার সামনে থেকে কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গিয়েছেন। জলধর সেনের 'হিমালয়' গ্রন্থে-এর সুন্দর বর্ণনা আছে। সেন মহাশয় অবশ্য ১৮৯০ সালে এই পথ দিয়ে গেলেও দড়ির ঝুলা তাঁকে পার হতে হয় নি। কারণ ১৮৮০ সালে কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী সুরজ্মল ঝুনঝুনিওয়ালা বহু টাকা ব্যয় করে পারাপারের জন্য লোহার তারের টানা পুল তৈরি করে দেন। সে পুল পার হতে কাউকে পয়সা দিতে হত না। ১৯২৮ সালে উমাপ্রসাদ তাঁর বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কেদার যাওয়ার পথে লছমনঝুলায় গঙ্গা পার হয়েছিলেন নৌকা করে। সুরজ্মলের পুল ১৯২৪ সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। এখন যে আমরা লোহার মজবুত সেতু দিয়ে অনায়াসে গঙ্গা পার হই তা ১৯৩৯ সালে তৈরি। তার কাছেই দেখা যায় পুরানো পুলের ভেঙে পড়া কঙ্কাল, যা সেকালের অনেক ঘটনার সাক্ষী।

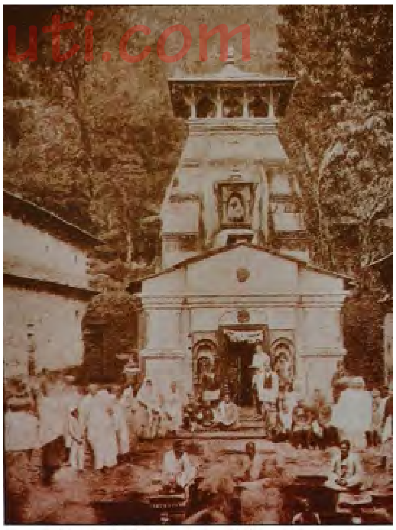

বিশ্বনাথ মন্দির, গুপ্তকাশী - ১৯১৬

গুপ্তকাশী, ২০১০

www.amaderchhuti.com

শিবালিক পর্বতের সানুদেশে হরিদ্বার, কন্‌খল ও হৃষীকেশ প্রভৃতি অঞ্চলকে বলা হত মায়াপুরী বা মায়াক্ষেত্র। সতী শিবের নিন্দাহেতু দেহত্যাগ করলে বিষ্ণু সুদর্শন দিয়ে সেই মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে দেন। সতীর জঠর এই হরিদ্বারে পড়ে, তাই একে একান্নপীঠের একপীঠ বলা হয়। মহামায়া স্বয়ং সতী রূপধারন করে এখানে জন্মগ্রহন করেন বলে নাম হয় মায়াপুরী। ভগীরথ সগররাজের ষাট হাজার পুত্রকে উদ্ধার করতে গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এনেছিলেন। পুণ্যসলিলা গঙ্গার আগমনে হরিদ্বারের নাম হয় গঙ্গাদ্বার। এখানের প্রধান আকর্ষণ ও দ্রষ্টব্য হল ব্রহ্মকুণ্ড। গঙ্গার একটি ধারা কুণ্ডের রূপধারণ করে দক্ষিণে আবার মূলধারায় মিলিত হয়েছে। এই কুণ্ডই ব্রহ্মকুণ্ড, যাকে স্থানীয় হিন্দিভাষীরা বলে থাকেন হর কী পৈড়ী বা হরি কী পৈড়ী অর্থাৎ হর বা হরির দর্শন লাভ করতে হলে হিমালয়ের প্রথম সিঁড়ি এখান থেকে চড়তে হয়। পুরাণ বলে এই স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেন এবং গঙ্গাদেবী ব্রহ্মার কমন্ডলুতে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মা যেখানে গঙ্গাদেবীকে মুক্তি দিয়েছিলেন সেই স্থানের নামই ব্রহ্মকুণ্ড। সেদিনের মত আজও সকল সম্প্রদায়ের মানুষ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রহ্মকুণ্ডে মুক্তি কামনায় অবগাহন করে থাকেন। আর পূর্ণকুম্ভের স্নানযাত্রায় তো

লছমনঝুলা - ১৯১৬ খ্রীঃ

লছমনঝুলা - ২০০৪

এই স্থান হয়ে ওঠে 'মহামানবের সাগরতীর'। হর কী পৈড়ীর পেছনে তিনদিকে
আজকের ব্যস্ত যাত্রীবহুল হরিদ্বার শহর, তারও পেছনে হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপ। সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় আমাদের চেনা জগৎটা, কিন্তু সেদিনের মত আজও গঙ্গার শীতল ধারায় অবগাহন করে হিমালয় দর্শনে যাত্রী ভুলে যায় সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, মনে পায় এক অব্যক্ত শান্তি। ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গার প্রধান ধারার মাঝে যে ছোট্ট দ্বীপ, যেখানে আজকের বিড়লা ঘড়িঘর আর তীর্থযাত্রীদের ভিড়, অতীতে তা ছিল তপোবন। কেউ সেখানে ভগবানের নাম জপ করতেন, কেউ ভজন -কীর্তণ করত, কেউ শাস্ত্রাদি পাঠ বা কথকতা করত, কেউবা ঈশ্বরের চিন্তায় আত্মনিমগ্ন থাকত। কেউ কেউ নির্জনে বসে পতিতপাবনী জাহ্নবীর শোভা দর্শন করে শান্তি লাভ করতেন। নদীর কলতান, পর্বতের বিশালতা প্রায় একই থাকলেও অরণ্যের শ্যামলিমার মত তপোবনের নির্জনতা ও শান্তি আজ হারিয়ে গেছে। তবে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে গঙ্গা-আরতি আজও এক অপূর্ব দর্শনীয় বিষয়। সন্ধ্যা নামলেই পূজারীরা ঝাড়দীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনিতে গঙ্গাদেবীর আরতি শুরু করেন। প্রজ্বলিত দীপশিখা হিমালয়ের পবিত্র বাতাসে ঢেউ তুলে এক অপার্থিব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। আড়ম্বর এবং যাত্রী-কলেবর এখন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, তবে সেদিনের মত আজও যাত্রীরা প্রদীপ ও ফুলসহ পাতার নৌকা গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দেন। প্রজ্বলিত দীপের শত শত পুষ্পতরী তরঙ্গে নাচতে নাচতে আজও হারিয়ে যায় অজানায়, যেমন করে এখনও আরতি শঙ্খ-ঘন্টার ধ্বনি হিমালয়ের নিস্তব্ধতার সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। চারদিকে সোপানশ্রেণী আর গঙ্গাদেবীর মন্দির। ঘাটের ধারে ধারে দেবালয় রয়েছে। হর কী পৈড়ীর ঘাটের পেছনেই যে অনুচ্চ পাহাড়, তার শিখরে মনসা দেবীর মন্দির। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে ২ কিমি উত্তরে ভীমগোড়া। প্রবাদ বলে, মধ্যমপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের সময় এখানে গদা ত্যাগ করেছিলেন। এর আরও ২ কিমি উত্তরে গঙ্গা সাতটি ধারায় বিভাজিত হয়ে 'সপ্তধারা' নামে প্রবাহিত। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে কিছুটা দক্ষিণে দত্তাত্রেয় মুনির সাধনাস্থল কুশাবর্ত ঘাট। এই রকম ঘাট ও মন্দিরের সংখ্যা এখানে অসংখ্য যে বারাণসীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

জলধর সেনের স্মৃতিচারনায়-‘হরিদ্বার হল তীর্থস্থান আর হৃষিকেশ সাধনাস্থান। হরিদ্বারে স্নান করে লোকে পবিত্র হইবার বাসনা করে আর হৃষিকেশে সাধনা করিয়া হৃষিকেশের দর্শন লাভের জন্য সাধু সন্ন্যাসী পড়িয়া থাকে। হরিদ্বার তীর্থ হলেও শহর, হৃষিকেশ তপোবন’। হরদূয়ার আর হরিদ্বারের দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র হিন্দি-বাংলায় নয়, হর এবং হরির বিবাদও। স্থানীয় দোকানদার একবার আমায় বলেছিল ‘হরিদ্বার ক্যা বাবু? হরদূয়ার বলিয়ে, এ নারায়ণজী কা নেহি, শঙ্কর মহাদেও কা স্থান’।

হরিদ্বার থেকে ২৪ কিমি উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম কুলে হৃষিকেশ, ভারতের বহু প্রাচীন তপোভুমি। এর তিন দিকই পাহাড়ে ঘেরা আর দক্ষিণদিক দিয়ে গঙ্গাবতরণ। হরিদ্বারের সঙ্গে বাস ও রেলপথে যোগাযোগ। ১৯০০ সালে নর্থ ইন্ডিয়ান রেল হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ ছুঁয়ে দেরাদুনে পৌঁছে যায়। যাত্রীদের জন্য এখানে অনেক ধর্মশালা আছে। আছে শতাব্দী প্রাচীন কালী-কমলি ও পাঞ্জাবী সত্র নামে দুটি অন্নসত্র। সাধুরা এই সত্র দুটিতে ভিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণতঃ ভিক্ষা হিসাবে ডাল-রুটি পাওয়া যায়, কখনও কখনও ভাত ও শাক মেলে। এখানে শাক বলতে তরকারি বোঝায়। কথা প্রসঙ্গে হৃষিকেশের বিখ্যাত মহাত্মা কালী-কমলি বাবার কাহিনি একটু বলে নেওয়া যাক। পাঞ্জাব থেকে এসে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ নিভৃতে দীর্ঘ তপস্যার উদ্দেশ্যে হৃষিকেশে বসবাস শুরু করেন। পরিমিত ভিক্ষার অভাবে সাধু-সন্তদের তপস্যার ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হন। চারধাম যাত্রীদের দুর্বিষহ পথকষ্ট লাঘবের জন্যও তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি ঠিক করলেন যে কোন প্রকারেই হোক সাধু-সন্তদের জন্য প্রতিদিন দুটো রুটির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সাল নাগাদ তিনি কলকাতায় গিয়ে বড়বাজারের রাস্তার ধারে কালো কম্বল গায়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতেন। প্রথমে কেউ তেমন খেয়াল করেনি, পরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কালো কম্বলপরিহিত সাধুমূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই কৌতূহল প্রকাশ করলে তিনি জানান, তাঁর নিজের জন্য নয়, হৃষিকেশের সাধু-সন্তদের জন্য দুটো রুটির ব্যবস্থা এবং চারধাম যাত্রীদের পথকষ্ট লাঘবের চেষ্টায় তাঁর কলকাতায় আগমন। সদাশয় ধনীদের সাহায্যে হৃষিকেশের অন্নসত্র চালু হয়। কালো কম্বল পরিধান করতেন বলে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কালী-কমলি বাবা নামে অধিক পরিচিত। বর্তমানে হাজার খানেক সাধু অনাথ ও বিদ্যার্থী রোজ এই সত্রে অন্নগ্রহণ করেন। বিদ্যার্থীদের জন্য কয়েকটি সংস্কৃত পাঠশালা ও অসুস্থদের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে এখানে।

www.amaderchhuti.com

শুধু শহরই বড়ো হয় নি, বেড়েছে মানুষজন, রাস্তাঘাট, বাজারহাট সেই সঙ্গে পরিবেশ ও মনের দূষণ। তবু স্বর্গাশ্রমের নিরিবিলি রাস্তা থেকে গঙ্গার শোভা আজও যেন ১৮৯০ সালে জলধরবাবুর দেখা জাহ্নবীর মতই রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন -‘হৃষিকেশের গঙ্গা দিন নাই রাত্রী নাই, অবিশ্রান্তভাবে শুধু ডাকিতেছেন আয়...আয়...আয়! সে ডাক যাহার কর্ণে একবার পৌঁছিয়াছে, সে কি আর পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে?’

লছমনঝোলার সেতু পার হয়েই কেদারনাথ অথবা বদ্রিনারায়ণ যাবার রাস্তার শুরু। তাই সেতু পেরিয়েই তীর্থযাত্রীর দল প্রাণ খুলে জয়ধ্বনি দিত ‘জয় কেদারনাথজী কি জয়, জয় বদরিবিশালা কি জয়’। লছমনঝুলার অপর পাড়ে স্বর্গাশ্রমের পাশ দিয়ে পায়ে চলার যে পথটা গিয়েছে, সে পথে ৩ কিমি এগোলে গরুড়চটি। অল্প নিচেই গঙ্গা, মনোরম পথশোভা দেখতে দেখতে আর নদীর গান শুনতে শুনতে যাত্রীরা পথ চলত দল বেঁধে। আরও ৩ কিমি এগিয়ে ফুলবাড়ি চটিতে কাটতো তাদের প্রথম রাত। হিমালয়ের হাঁটাপথ সেকালে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা না থাকলেও যাত্রীরা পথ চলত সূর্যের গতি ও বাঁধাধরা কিছু নিয়ম মেনে। যেমন পূবের আকাশ ফর্সা হওয়ায় অনেক আগেই যাত্রীরা শয্যা ত্যাগ করে বিছানা-কম্বল গুটিয়ে নিত। মালবাহক, ডান্ডি-কান্ডি -ঘোড়াওয়ালারা এসে যাত্রাশুরুর তাগাদা দিতে শুরু করে দিত। তাদের পোঁটলা-পুটলি রাত্রেই গুছানো থাকত। সাধু সন্ন্যাসীদের সে ঝামেলাও নেই, কম্বলই একমাত্র সম্বল। পথের ধারে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে গত রাতের বেঁচে যাওয়া রুটি কি অন্য কোন খাবার মুখে দিয়ে লণ্ঠন হাতে পথে নামা। খালি পেটে পাহাড়ি পথে হাঁটলে অসুখের সম্ভাবনা, আবার দেরি করে যাত্রা শুরু করলে রোদের তাপে পথ চলাও ছিল কষ্টকর। দুপুরে নতুন কোন চটিতে থামা, স্নানাহার এবং ক্ষণিকের বিশ্রাম। বিকালে আবার পথ চলা, সন্ধ্যায় নতুন চটি নতুন যাত্রীর কোলাহলে মুখর। রাত সাতটা বাজতে না বাজতেই পথ নির্জন হয়ে যেত, চটিগুলোও ঘুমিয়ে পড়ত।

চারদিকে পাহাড়ের সারি আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে যাত্রীরা দেখত নদীর অপর পারে গহন বন, বন্যপশুরা জল খেতে নদীতে নেমেছে। ১৯৫৫ সালে উমাপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গী শেষকিরণ বিশাল এক হাতির দলকে পূর্ণিমার রাত্রে জলকেলি করতে দেখেছিলেন। ফুলবাড়ি চটির পাশে নদীর ধারে একটা পাথরের ওপর বসে দেখেছিলেন ত্রিশ-চল্লিশটা হাতি শুঁড় দিয়ে কি ভাবে একে অপরের গায়ে ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সময়ের কি বিচিত্র গতি। গঙ্গার সেই দক্ষিণের বিজন অরণ্যময় পাড় বরাবর আজকের ব্যস্ত রাস্তা লোকবসতি, মানুষ ও গাড়িঘোড়ার চলাচল। হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ যেতে যেতে গাড়ির জানালার ডানদিকে চোখ রাখলে নদীর অপর পারে দেখা যায় প্রাচীন সে যাত্রাপথের চিহ্ন। কোথাও রাস্তা আছে, কোথাও বা নেই। পরিত্যক্ত সে পথে আজ আর যাত্রী নয়, দু-একজন স্থানীয় মানুষের চলাচল। পথের ধারের সেকালের শান্ত সমৃদ্ধ গ্রাম আর চটিগুলো আজ নিতান্তই শ্রীহীন, কোথাও বা চড়ে বেড়াচ্ছে দু-একটা গরু ছাগলের পাল।

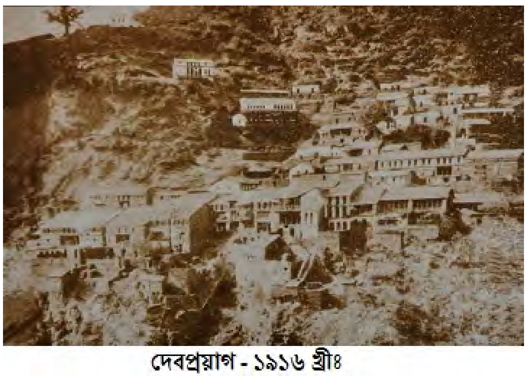

দেবপ্রয়াগ - ১৯১৬ খ্রীঃ

একবার স্বর্গাশ্রম থেকে হাঁটতে হাঁটতে ফুলবাড়ি চটির দিকে গিয়েছিলাম। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরে পেতে। ক্ষেতের কাজ ফেলে গ্রামের লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ভাবে পাগল বুঝিবা। উদ্দেশ্য জানতে পেরে প্রাচীন এক গ্রামবুড়ো জানালো যে বহুবছর আগে দু-একজন সাধু সন্ন্যাসী কিংবা সঙ্গতিহীন যাত্রী, গ্রামবাসীদের দেওয়া আশ্রয় ও অন্নের উপর ভরসা করে এপথে দিয়ে যাত্রা করত। এখন আর তেমন একজনকেও দেখা যায় না, তাই তাঁদের চোখে আমাদেরকে অদ্ভুত লেগেছিল। পদব্রজে এখনও অনেক সাধু চারধাম পরিক্রমা করেন দেখেছি, তবে তা গাড়ি যাওয়ার পিচের রাস্তা দিয়ে। ২০০৭ সালে মে মাসে রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়িয়ে কেদারযাত্রী এক জটাজূটধারী সাধুকে দেখেছিলাম একলা পথ চলতে। মাথায় ছাতা, চোখে রোদচশমা, হাতে সরব ট্রান্‌জিষ্টার, তবে খালি পা। তবে কেদারের পথে আজও ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে অবাঙালি যাত্রীর যতটা দেখা মেলে, বাংলাভাষীর সংখ্যাটা ততটা নয়। যাত্রাপথ এখন সহজ নিরাপদ, সর্বত্র মেলে থাকা খাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য, তবুও ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির শতকরা পঞ্চাশ

ভাগ কেন যে দেবলোকের প্রবেশদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বার-হৃষীকেশ থেকেই ফিরে যায় তা বুঝতে পারি না!

রুদ্রপ্রয়াগ - ১৯১৬ খ্রীঃ

দেবপ্রয়াগ - ২০১০

এবারে সেকালের যাত্রীদের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। হিমালয়ের পথে যাত্রা করে বেঁচে ফিরবেন সেরকম আশা না করেই তারা রওনা দিতেন। পথ ছিল শ্বাপদশঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে, কখনও ভাঙাচোরা ধ্বসপ্রবণ এলাকা, আবার কখনওবা হিমবাহের উপর দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হত। ছিল খাদ্য, আশ্রয় এবং পরিশ্রুত জলের অভাব। অসংখ্য মাছির অত্যাচারে যাত্রীদের শয়ন ভোজন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। আর ছিল পিসু আর বিষাক্ত কীটের দংশন। যাত্রার প্রাক্কালে হৃষীকেশে বিষাক্ত কীটের কামড়ে জলধর সেনের জীবন সংশয় হয়েছিল। এর ওপর ছিল কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব। এসব ছেড়ে দিলে শুধু মাত্র খাদ্য আর শীতবস্ত্রের অভাবে কত না যাত্রী পথের ধূলায় লোকচক্ষুর সম্মুখে নিতান্ত অবহেলায় প্রাণ হারাতেন। দীর্ঘ এই নির্বান্ধব অনিশ্চিত পথে কেইবা অন্যকে সাহায্য করার সঙ্গতি রাখত। দীন দরিদ্ররা হরিদ্বার-হৃষীকেশে অপেক্ষা করত দিনের পর দিন, কোন ধনী, শেঠ কিংবা বড়োমানুষের অনুগ্রহে তাদের দলে স্থান পাওয়ার জন্য। অনেক পরে কালী-কমলির (কার্তিক ১৮৮৪ সাল নাগাদ স্থাপিত) সদাব্রত চালু হয়। প্রধানত সাধু সন্ন্যাসীরা হৃষীকেশ থেকে সদাব্রতের টিকিট পেতেন। এই টিকিট থাকলে যাত্রাপথের প্রতিটি ধর্মশালায় স্থান ও ভান্ডারা মিলত বিনা পয়সায়। রাজা রাজড়াদের কথা ছেড়ে দিলাম, গত শতকের প্রথম দিকেও অধিকাংশ ধনী শেঠরা অনেক লোকজন, ডান্ডি কান্ডি, ঘোড়া নিয়ে তীর্থে যেতেন। তাদের সেই ১০০-২০০ জনের দলে অনেক রবাহূত, অনাহূত দরিদ্রজনের অনায়াসে স্থান মিলত। চলার পথে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এসে চাইতো -'এ বাবু, দেও সুই তাগা, দেও পাই পয়সা'। তরুণী ও গৃহবধূরা চাইতো রঙিন টিপ। তাদের চাহিদা ছিল অতি সামান্য, শহুরে এই তুচ্ছ জিনিষগুলো হাতে পেলে আনন্দ তাদের বাঁধ মানত না। নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ফিরে যেত তারা নিজেদের ঘরে। উমাপ্রসাদের লেখায় তাদের সেই গানের দু-একটা কলিতে তীর্থযাত্রীদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়-

'কোই খায় হালুয়া পুরী বরফি মিলাকে,

সাধু খায় সুকড়া টুকড়া চিমটা বজাইকে।

কোই যায় হাতি ঘোড়া পালকি সাজাইকে,

সাধু যায় পাঁও পাঁও চিমটা বজাইকে'।

রুদ্রপ্রয়াগ - ২০১০

www.amaderchhuti.com

রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী দিব্যাত্মানন্দ জ্যোতিষ মহারাজকে সঙ্গে করে ১৯৪০ সালে কেদার-বদ্রী দর্শনে গিয়েছিলেন। হিমালয় যাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা হল -'মধ্যাহ্নে আহারান্তে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের জয়ধ্বনি দিয়া যাত্রা শুরু করেছিলাম। কাঁধে কম্বল ও বর্ষাতি, হাতে লাঠি ও ছাতা, পায়ে জুতো, মাথায় টুপি, কাঁধে একটা থলে। তাতে টুকিটাকি জিনিস যেমন দাঁতের মাজন, সাবান, মিশ্রি, দেশলাই ও মোমবাতি। কোমরের কাপড় দিয়ে কম্বল ও বর্ষাতি বাঁধা। গায়ে জামা। যাত্রীদের সঙ্গে গঙ্গার পূর্বতীর দিয়ে চলেছি, কোমরে কমন্ডলু আছে'।

ফুলবাড়ি পেরিয়ে ছিল বিজনীর বিখ্যাত চড়াই। হিজলী নদীর পুল পেরিয়ে নাইমোহনায় চড়াই-এর শুরু, তা অতিক্রম করতে অনভ্যস্ত গৃহী যাত্রীদের অবস্থা হত প্রাণান্তকর। পাহাড়ের মাথা টপকে অপরদিকে গঙ্গার কিনারায় নামা। সেখানে ছিল বন্দরমেলা চটি। সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই রাতের খাওয়া সেরে কম্বলের বিছানায় শয়ন। তবে ঘুম এলে তো? পায়ের ব্যথায় উঃ আঃ করতে করতে জাগরণে, তন্দ্রায় রাত যেত কেটে। এই প্রসঙ্গে স্বামী দিব্যাত্মানন্দ লিখেছেন- '...প্রথমেই এত বড় দুটি চড়াই উঠিতে হয়। আর অন্য পথ ছিল না। এই চড়াইতে আমরা একটু ক্লান্ত হয়েছিলেম। বারো মাইল চড়াই শেষ করিয়া বন্দর চটিতে রাত্রির মত বিশ্রাম। পথের তালিকা দেখিলাম, চটিতে পৌঁছিয়ে তালিকা দেখা প্রথম কাজ ছিল......বিশ্রামান্তে যাত্রা করিব, মনে হইল যেন খুব ক্লান্ত। জ্যোতিষ মহারাজ বলিলেন -তুমি ফিরিয়া যাও, আমি একাই যাইব। তোমার কষ্ট হইবে। সামনেই চারজন বৃদ্ধা পুঁটলি মাথায় লাঠির সাহায্যেও কুঁজো হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া সাহস বাড়িল, আমিও যাইতে পারিব। নিশ্চয়ই দর্শন করিব। কম্বল কাঁধে আবার চলিতে শুরু করিলাম'।

গুপ্তকাশী থেকে কিছুটা নেমে নালা চটি। ডানদিকের পথ মন্দাকিনীর পুল পার হয়ে উঠে গেছে উখিমঠ। সেখান থেকে চোপতা-গোপেশ্বর হয়ে লালসাঁঙায় মিশেছে বদ্রীনাথের পথে। নালা চটি থেকে বাঁদিকের পথে ১২ কিমি মৈখন্ডা এবং আরও ২ কিমি এগিয়ে ফাটা চটি। আট মাইল পর মৈখন্ডা। এখানের দ্রষ্টব্য মহিষমর্দিনীর মন্দির। মহিষমর্দিনী এখানে মহিষাসুরকে বধ করে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাই থেকে নাম হয় মৈখন্ডা। সেযুগে ফাটায় কাঠের নানারকম নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস এখানে তৈরি হত। বেশ বড় চটি। অনেক দোকান। একটা পান বা পানী চাক্কি ছিল এখানে, নদীর স্রোতে চলতো। স্থানীয় লোকেরা এতে গম পেষাই করে নিজেদের আটার সংস্থান করত। ফাটা চটির সুদিন আর নেই। সেদিনের কোলাহল মুখর ফাটা কখন পার হয়ে যায় তা গাড়ি বা বাসের যাত্রীরা এখন জানতেও পারেন না।

ত্রিযুগীনারায়ণ - ১৯১৬ খ্রীঃ

কেদারের পথে গৌরীকুন্ড পর্যন্ত যে বাস রাস্তা, ত্রিযুগীনারায়ণ সেই পথে পড়েনা। শোনপ্রয়াগ থেকে বাঁদিকের আদিম জঙ্গলাকীর্ণ সেই ২৫ কিমি রাস্তা যেতে গাড়ি ভাড়া করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। সেযুগের কেদার দর্শনার্থী নারায়ণের পুজো দিয়ে মহাদেবের দর্শনে যেতেন। ১৯৪৯ সালের আগে গঙ্গোত্রী ফেরত যাত্রীরা ভাটোয়ারী থেকে ঘুত্তু-ত্রিযুগী হয়ে কেদারের পথ সংক্ষেপ করতেন। সারাটা পথে ছিল বন্যপ্রাণীর ভয় এবং তাদের দলবেঁধে চলতে হত। সেই পথ আজ পরিত্যক্ত, উৎসাহী ট্রেকারদের কখনও সখনও দেখা যায় স্থানীয় গাইড নিয়ে চলেছে। ত্রিযুগী নারায়ণ অষ্টধাতু নির্মিত এবং মন্দিরটি অনেক প্রাচীন। ১২৫ বছর আগে জলধরবাবু এই মন্দিরকে 'অতিশয় প্রাচীন' দেখেছিলেন। তার লেখায় - 'নারায়ণ এখানে একাকী নাই, পাণ্ডা মহাশয়েরা আরও ছোট ছোট অনেক দেবদেবীকে এই মন্দিরের আশেপাশে ছোটখাটো মন্দির প্রস্তুত করিয়া বসাইয়াছেন এবং যাত্রীদিগের নিকট হইতে এই সকল ক্ষুদ্র দেবতারাও যৎকিঞ্চিত কাঞ্চনমূল্য পাইয়া থাকেন। এখানে কয়েক ঘর পান্ডার বাড়ি আছে এবং তাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়'।

ত্রিযুগীনারায়ণের থাকার জন্য গুটি কয়েক ধর্মশালা রয়েছে। পাথরের ছাদওয়ালা কালী-কমলির ধর্মশালা প্রাচীন ও সেরা। মন্দির ও সংলগ্ন স্থানের পরিবর্তন বিশেষ একটা হয় নি। ১৯১৪ সালের তোলা একটি ফটোগ্রাফের সঙ্গে বর্তমানের অবস্থার তুলনা করলে সহজেই নজরে আসে। মনে হয় যাত্রী আগমন আজও কম বলে স্থানটি তার স্বকীয়তা বজাই রাখতে পেরেছে। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ এই স্থান প্রসঙ্গে

ত্রিযুগীনারায়ণ - ২০১০

লিখেছেন 'এখানে বেশ ঠান্ডা। কাঁপুনি বন্ধ হইল না। মন্দিরে আসিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণজীকে দর্শন করি। নাটমন্দিরে একটি ধুনি। প্রবাদ এই যে সত্যযুগ থেকে এই ধুনি জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া গা গরম করিবার ইচ্ছা। কিন্তু পান্ডাদের ব্যবহারে দাঁড়াইতে পারিলাম না। আস্তানায় ফিরিয়া আসি'।

রামপুর থেকে ৫ কিমি চড়াই ভেঙ্গে শোনপ্রয়াগ। শোন বা সোম গঙ্গার সঙ্গে মন্দাকিনীর মিলন এখানে। সেকালের দড়ির ঝুলা, আর আজকের লোহার মজবুত পুল পার হয়ে শুরু কেদারনাথের চড়াই। এরপর গৌরীকুণ্ড আরও ৬ কিমি। সেদিনে হৃষীকেশ থেকে গৌরীকুন্ড ছিল ১২ দিনের দীর্ঘ পদযাত্রা। আর আজ গাড়িতে বসে ১০/১২ ঘন্টায় শেষ হয়ে যায় পথচলার সেই ইতিবৃত্ত।

গৌরীকুণ্ডে এখন অসংখ্য ধর্মশালা, হোটেল, গাড়িঘোড়া এবং দোকানপাট। আছে গৌরী দেবীর মন্দির আর দুটো কুণ্ড। একটাতে গরম জল, বলে তপ্তকুণ্ড। অন্যটা শীতল জলের, বলা হত গৌরীকুণ্ড। প্রবাদ বলে গৌরী এই কুণ্ডে ঋতুস্নান করেছিলেন। এখন কুণ্ড দুটোকেই গৌরীকুণ্ড বলা হয়। উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে কেদার দর্শন। এবারের বাকি রাস্তাটুকু পায়ে হাঁটা। অক্ষম কিংবা আয়েসী যাত্রীদের জন্য মেলে ডান্ডি, পিট্ঠু আর ঘোড়া। ডান্ডিতে যাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের হলেও ঘোড়ায় চড়া মোটেই আরামদায়ক নয়, বিশেষ করে নেমে আসার সময়।(পিট্ঠুতে চড়া অত্যন্ত কষ্টকর, আরোহী ও বাহক উভয়ের ক্ষেত্রেই। এবং অমানবিক কারণ চড়াই পথে নিজেকে টেনে তোলাটাই যেখানে কষ্টসাধ্য, অপর যাত্রীকে পিঠে করে টেনে তোলা, তা যতই গ্রাসাচ্ছাদন বা রুজির টানে হোক না কেন)। আগে এই পথ ছিল অতি সংকীর্ণ, বিপদসঙ্কুল যেন -'পা ফসকালেই জীবনলীলা সাঙ্গ'। সেই পথ এখন নিরাপদ, তবে খাড়া চড়াই-এর জন্য পথশ্রম একই রয়ে গেছে। ৩ কিমি পর জঙ্গল চটি, এখনও আদিম অরণ্যের নিবিড়তা অনেকটাই দেখা যায়। চড়াই বেয়ে বনের ছায়ায় ছায়ায় রামওয়াড়া আরও ৩ কিমি। উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফুট। আগে ছিল থাকার জন্য গুটি কয় ধর্মশালা, একটি মাত্র দোকান যেখানে -'একটি পাত্রে গুড়ের চা ফুটিতেছে, যাত্রীদের জন্য। এই পথে প্রথম চায়ের ব্যবস্থা'। এখানেও কম্বল ধার দেওয়া হত। পথের পাশে পাশে মন্দাকিনীর উচ্ছল নীল ধারা। মন্দাকিনীকে বলা হয় সুরনদী কারন সুরলোকে তার জন্ম। বৈদিক ভারতের ঋষি-মুনিরা দেশ-নদ-নদী, অরণ্য-সাগর-পর্বত ইত্যাদির নামকরণে কতটা মননশীল ছিলেন তা হিমালয়ে এলে বোঝা যায়। নদীর ওপারের পাহাড়গুলোতে ঘন জঙ্গল, মাথায় তাদের বরফের মুকুট। সেই বরফ গলে নেমে আসে ঝরনা, সূর্যের আলোয় রামধনু খেলে তাতে। পাহাড়ের সবুজ ঢালে চড়তে থাকে বুনো ছাগল কিংবা হরিণের দল। সেকালের মত একালের যাত্রীও দেখতে দেখতে চলে আর চলতে চলতে থমকে যায়। ক্রমাগত চড়াই-এর মুখে একটু বসে বা লাঠিতে ভর করে জিরিয়ে নেয়।

এসকর্ট' করছে। ধীরে ধীরে তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও মন কেমন করা পাহাড়িয়া সুর মনে সারাদিন রয়ে গেল।

রামওয়াড়ার পর চড়াই আরও বেশি, হাঁপ ধরে। যতই উপরে উঠি মনে হয় পথ বুঝি শেষ, চড়াই-এর যেন শেষ নেই। শরীরের অবস্থা কাহিল, ঘর্মাক্ত দেহ। আবার ঠাণ্ডায় লাঠি ধরে রাখা শক্ত, লাঠি ছাড়াও চলা কঠিন। এভাবে ৫ কিমি উঠে এসে দেও-দেখানী - দূরে কেদারনাথের মন্দির প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। এখনও ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যাত্রী হাঁক দেয় -'জয় কেদারনাথ জী কি জয়'। শেষ ২ কিমি রাস্তাটুকু প্রায় সমতল। এই পথটুকু আর ফুরাতে চায় না। কখন এই পথটুকু দেখেছি তিন-চার ফুট বরফে ঢাকা, কখন শুকনো খটখটে, কখনও বা কাদাজল ও ঘোড়ার মলে মাখামাখি। মাত্র ২২ বছরে ১৪ কিমি রাস্তা কম বদলে যায়নি। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ লিখেছেন -'প্রায় এক মাইল পথ, সমস্ত রাস্তাটিতেই বরফ। চারদিকে পর্বতশ্রেণী বরফে ঢাকা। সূর্যের কিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাকানো যায় না। এমনটা জীবনে কখনও দেখি নাই। আর দেখিব কিনা কিনা সন্দেহ'। প্রথমবারে সেই ১৯৮৪ সালে দেখেছিলাম পথের বেশির ভাগটাই মাটি আর কাঁকড়ের, ধ্বসপ্রবণ এবং যেখান দিয়ে ঝরনা নেমেছে সেখানেই পাথরে বাঁধানো। বছর চারেক পরে দেখি রাস্তার অনেকটাই বাঁধানো হয়েছে আর সিঁড়ি হয়েছে কোথাও কোথাও। পরের বারে দেখি পথের বাঁকে বাঁকে লোহার রেলিং বসেছে। ২০০৪ সালে দেখি রাস্তার প্রায় বেশির ভাগ জায়গায় রেলিং পাতা হয়ে গেছে। নামবার সময় পাকদণ্ডি ব্যবহার করার যে সুযোগ ছিল তা আর নেই। ২০১০ সালের নভেম্বরে দেখি পথের ধারে কিছু দূর অন্তর অন্তর সবুজ রং করা লোহার বেঞ্চ, পাশে চা-কফি-কোকের দোকান। বৈদ্যুতিক আলোর খুঁটি পোতা হয়ে গেছে, তার সংযোগ করা হচ্ছে। এবারে হয়তো দেখব, রাস্তা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত, বৈষ্ণোদেবীর মতো যাত্রী চলেছে সারা রাত ধরে। সময় থেমে থাকে না, পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হয়।

www.amaderchhuti.com

কেদারনাথ মন্দির - ১৯১৬ খ্রীঃ

মন্দাকিনীর উপর লোহার পুল পার হয়ে একটু উঠতেই মন্দির। দশটা সিঁড়ি ভেঙ্গে পাথরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সামনেই কষ্টিপাথরের বিশাল নন্দী ও প্রবেশদ্বার। তারপর দোচালা নাটমন্দির, যার অলিন্দে পাথর কেটে তৈরি বহু পৌরাণিক চরিত্র। চতুষ্কোণ মূল মন্দির তথা গর্ভগৃহ পঞ্চাশ ফুট উঁচু। মাথায় নহবতের মত ছপ্পর, তার উপর কলসচূড়া। তার প্রেক্ষাপটে ধ্যানমগ্ন তুষারমৌলী কেদার শিখর। কেদার নাথেরও এক প্রচলিত ইতিহাস আছে। কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন হত্যার পাপ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে পঞ্চপান্ডব কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শনে যান। বিশ্বনাথ দর্শন না দিয়ে হিমালয়ে পলায়ন করেন। পাণ্ডবরা হিমালয়ে এসে খুঁজতে আরম্ভ করেন। বিপদ বুঝে দেবাদিদেব মহিষরূপ ধারণ করে রাক্ষসরাজের মহিষদলে আত্মগোপন করলেন। যুধিষ্ঠির ধ্যানে জানতে পারলেন বিশ্বনাথ মহিষদলে আত্মগোপন করে আছেন। ভীম দুটি খুঁটির মাঝে পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন আর অন্যরা মহিষগুলোকে তার ভিতর দিয়ে তাড়াতে লাগলেন। বিশ্বনাথ ছাড়া সকলে পার হয়ে গেল। এবারে পাণ্ডবরা বিশ্বনাথকে ধরতে ছুটলেন। মহিষরূপী বিশ্বনাথ শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ে পাতালে প্রবেশে করতে থাকেন। কেবল পশ্চাৎদেশ বাকি, ভীম গদা দিয়ে ভীমাঘাত করলেন। বিশ্বনাথ ওই অবস্থাতেই স্থিত হলেন। মহিষের পশ্চাৎদেশ ত্রিকোণাকার প্রস্তরে পরিণত হল। সেই শিলাই পূজিত হয়। বিশ্বনাথের দর্শন পেয়ে পাণ্ডবগণ পাপ মুক্ত হন এবং এখান থেকেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন।

মন্দিরের ভেতরে কেউ পুজো করছে, কেউ স্তোত্রপাঠ করছে, কেউ বা শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করে ধ্যানমগ্ন। মন্দিরের বাইরে প্রদক্ষিণের ফাঁকে ফাঁকে কেউবা করছে দেবদর্শন। আমি দেখি যাত্রীদের, তাদের বেশভূষা, পুজার্চনার রকমফের, তাদের হাসি আর আনন্দাশ্রু। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই শঙ্করাচার্যের সমাধি মন্দিরের পাশ দিয়ে অনেকটা ওপরে, নদীর ধারে। এই পাহাড়, নদী, সমগ্র উপত্যকা এবং তার মাঝে কালজয়ী এই মন্দিরকে একসঙ্গে দেখব বলে। দূর থেকে ভেসে আসে ঘন্টার ধ্বনি। অপার সৌন্দর্যের মাঝে মিথ্যে হয়ে যায় ধর্ম, তুচ্ছ বোধ হয় তীর্থযাত্রার ফল। মাথা এমনিতেই নত হয়ে আসে সেই স্থপতির কথা ভেবে, যিনি মন্দির স্থাপনের জন্য এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন। পর্বতের এই বিশালতার মাঝে, সর্বব্যাপী এক নিস্তব্ধতার মধ্যে মনের মাঝে নেমে আসে এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতা, সময় থমকে যায়। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ গৃহীদেরও মনে হয় যে পাওয়ার মত আর কিছু বাকি নেই, দেওয়ারও নেই আর কিছু। সেই অনন্ত অসীমকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে আসি বারে বারে।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ১৯১৬-র ছবিগুলি শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তোলা)

~ তথ্য - গাড়োয়াল হিমালয় ~ গাড়োয়াল হিমালয়ের ছবি ~

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরায়ণ সচিবালয়ে কর্মরত বিভাস ভ্রমণ, বিশেষতঃ ট্রেকিং-এ উৎসাহী। ভালোবাসেন ভ্রমণ নিয়ে নানা গবেষণামূলক লেখা লিখতে। হিমালয়

- বিশেষ করে মন্দিরময় গাড়োয়াল আর সেখানকার জনজীবন তাঁর প্রিয় বিষয়।

কেদারনাথ মন্দির - ২০১০

Rate This : - select -
Total Votes : 17
Average : 4.06

Like 8 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

Post Comments

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

মাওয়ালি পাসের পথে

সুদীপ বিশ্বাস

~ মাওয়ালি পাস ট্রেক রুট ম্যাপ ‖ ট্রেকের আরো ছবি ~

১৪ জুন, ২০১১

আজ থেকে আমাদের আটজনের দলের হাঁটা শুরু। আজকের গন্তব্য কেদারনাথ। ১১ তারিখে কলকাতা থেকে দুন এক্সপ্রেসে রওনা দিয়ে গতকাল রাত্রে গৌরীকুণ্ড পৌঁছেছি। আমরা অর্থাৎ বারুইপুরের 'অনুভব নেচার লাভারস অ্যাসোসিয়েশন' -এর সদস্য এবং টিম ম্যানেজার বাবলুদা, লিডার আমি, কোয়ার্টার মাস্টার সমীরণ, ধ্রুবদা, চিন্ময়, রাউতদা মানে বিনোদ কুমার রাউত, অর্পণ আর রজত।

সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। কেদারের পথ যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি নোংরা - পথচারী, যাত্রীবাহী ঘোড়া, ডুলি সব একসাথে ধাক্কা খেতে খেতে পথচলা। এরমধ্যে বৃষ্টি এসে পথ আরও অকথ্য করে তুলল। পুরো রাস্তার ২-৩ কিলোমিটার বাদে সবটাই কম-বেশি চড়াই। সুবিধার জন্য আমরা দুটো-তিনটে দলে ভাগ হয়ে হাঁটছিলাম। এরমধ্যে আবার ধ্রুবদার পা মচকাল। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ কেদারে পৌঁছে একটা ডরমিটরিতে আশ্রয় নিলাম। সবাই বেশ ক্লান্ত। কিন্তু রান্না-খাওয়া সেরে বাইরে এসে দাঁড়াতেই প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে একনিমেষে ক্লান্তি কেটে গেল। রাতের পরিষ্কার আকাশ ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। সেই আলো পড়ে অপরূপ হয়ে উঠেছে কেদারনাথের মন্দির আর শৃঙ্গ।

১৫ জুন, ২০১১

আজ বিশ্রামের দিন। সিদ্ধ ডিম, বিস্কুট, কাজু, কিসমিসের প্যাকেট লাঞ্চ নিয়ে আমরা চললাম চোরাবালিতাল দর্শনে। এখানেই প্রথম বরফের দেখা পেলাম। সারাটাদিন অনেক মজা করে কাটিয়ে বিকেলে আবার কেদারে ফিরে এলাম। এপথে যেটা প্রথম থেকেই অসুবিধা হচ্ছে যে পোর্টারদের সঙ্গে ঝামেলা লেগেই আছে। খাবারদাবারের হিসেবও সব মিলছেনা। যাইহোক বাকি খাবার দিয়ে ডিনার সেরে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কাল থেকে আবার হাঁটতে হবেতো।

১৬ জুন, ২০১১

সকাল সাড়ে ন'টায় স্যাক কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম। আজকের গন্তব্য বাসুকিতাল। কেদারনাথ মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁদিকে যে পর্বতশিখর দেখা যায় তার পিছনেই বাসুকিতাল। এই ৮ কিলোমিটার রাস্তা প্রায় পুরোটাই বেশ চড়াই। মেঘমুক্ত ঝকঝকে নীল আকাশ, থার্মোমিটারের পারদ ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। পৌঁছানোর দু'কিলোমিটার আগে হঠাৎ ঘন সাদা মেঘে চারদিক প্রায় ঢেকে গেল, মাত্র পাঁচ ফুট দূরেও কিচ্ছু দেখা যাচ্ছেনা। ঘড়িতে তখন বেলা তিনটে। রাউতদার পরামর্শ মতো সেখানেই থামলাম। এই যাত্রায় আজকেই প্রথম টেন্টে থাকা হবে, তোরজোড় শুরু হয়ে গেল। বিরাট এক বরফ উপত্যকার গা ঘেঁষে আমাদের টেন্ট পড়ল। বরফ গলানো জলে তৈরি হল গরম গরম স্যুপ আর ম্যাগি। খাওয়াদাওয়া শেষ করে পাশের বরফের ময়দানে শুরু হল আমাদের বরফে চলার নেট প্র্যাকটিশ।

www.amaderchhuti.com

বাসুকি তালের কাছে

১৭ জুন,২০১১

সকালে চলতে শুরু করেই বোঝা গেল সেদিন ধ্রুবদার পায়ে বেশ ভালমতোই লেগেছিল। ফলে আর না এগিয়ে ফিরে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল ধ্রুবদা। ওর সঙ্গে অর্পণ আর একজন পোর্টারও ফিরে গেল। আমরা এগিয়ে চললাম।

ওপরে পৌঁছে দেখি চারদিক একেবারে সাদা - কঠিন বরফ আর নরম তুষারে ঢেকে রয়েছে - যেন কোন স্বপ্নপুরীর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। একটা পাথরের ওপর বসে যে যার প্রয়োজনমতো গেটার, সানগ্লাস ইত্যাদি পরে নিলাম। সামনে আর কোন পথ নেই - গাইডের পিছু পিছু পাহাড়ের ঢাল ধরে ধরে হাঁটা। কোথাও নরম বরফে এক-দেড় ফুট পর্যন্ত পা ডুবে যাচ্ছে। তবে এপথে চড়াই তেমন নেই, বাসুকিতাল পর্যন্ত পুরোটাই প্রায় উতরাই।

বাসুকিতাল প্রায় সবটাই বরফের চাদরে ঢেকে রয়েছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই যেন ধু ধু বরফের মরুভূমি। সাদা মেঘ নেমে এসেছে অনেকটা নীচে, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সামনে প্রায় কিছু দেখা যাচ্ছেনা - যেন এক মায়াবী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। আরও দু' কিলোমিটার এগিয়ে একটা বরফগলা নদীর পাশে ভারী সুন্দর জায়গায় আমরা তাঁবু ফেললাম। নদীর সামনেই মাওয়ালি পাসে ওঠার পথ আর পিছনে একের পর এক নাম না জানা তুষারশৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাপমাত্রা শূন্য থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই রয়েছে।

১৮ জুন, ২০১১

সকালে ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। আজকের গন্তব্য মাওয়ালি পাস পেরিয়ে মাসার তাল। কিন্তু ভাবা এক, হয় আরেক...। দু'জন পোর্টারের শরীর খুব খারাপ, তারা ফিরে গেল এখান থেকেই। বাকি চারজন পোর্টারের কাছেই আমাদের ছ'জনের মালপত্র। ফলে তারা ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগল। গাইডও পোর্টারদের ওপরে নজর রাখতে পিছনে রয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা যখন পাস থেকে আর মাত্র দু' কিলোমিটার দূরে তখন ওদের কাউকেই আর দেখতে না পেয়ে একটা পাথরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘন্টা দুয়েক বসে থাকার পরও কারোর দেখা নেই। এদিকে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে আস্তে পড়লেও ক্রমশ তার তেজ বাড়ছে। পাথরের দেওয়ালে একটা গর্তের মতো জায়গা ছিল, তাতেই আশ্রয় নিলাম। যতক্ষনে গাইড আর পোর্টাররা এসে পৌঁছালো ততক্ষনে সাদা মেঘে চারদিক ঢেকে গেছে...তুষারপাতও বাড়ছে। আমরাতো ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি। আর না এগিয়ে এখানেই টেন্ট পাতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। একটা টেন্টেই ছ'জনে আশ্রয় নিলাম গা গরম রাখতে। প্রায় ৪৮০০ মিটার অল্টিচুডে তাপমাত্রা শূন্যের বেশ কয়েক ডিগ্রি নিচে।

১৯ জুন, ২০১১

ঝকঝকে একটা সকাল। সূর্যের আলো বরফের ওপর পড়ে চোখ ঝলসে দিচ্ছে। সানগ্লাস ছাড়া কোন উপায় নেই। পৌনে ন'টা নাগাদ চলা শুরু। বেশ খানিকটা প্রাণান্তকর চড়াই পেরিয়ে মাওয়ালি পাসের ঠিক আগে একটা বরফের প্রান্তরে পৌঁছে কালকের মতোই আবার অপেক্ষা গাইড আর পোর্টারদের জন্য। প্রায় সাড়ে তিনঘন্টা পরে আবার সবাই একত্র হলাম।

বেলা একটা নাগাদ আবার যাত্রা শুরু। প্রচণ্ড খাড়া চড়াই - হাত, পা সব দিয়েও যখন এগোনো যাচ্ছেনা তখন গাইড আর রজত মিলে আইস-এক্স দিয়ে বরফ

কেটে ধাপ তৈরি করছে। অবশেষে প্রায় সোয়া দুটো নাগাদ ৫৪০০ মিটার উঁচু বহু আকাঙ্খিত মাওয়ালি পাসে পৌঁছালাম। এত উঁচুতে ধু ধু বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। হাতে বেশি সময় নেই, সন্ধ্যের মধ্যেই মাসার টপে পৌঁছতে হবে। পুজো দিয়ে, সবাই মিলে ফটো তুলে আবার নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম।
নরম তুষারে কোথাও একফুট আবার কোথাওবা দু'ফুট মতো পা ডুবে যাচ্ছে। খানিকটা নামার পর সামনে ৩৫০ ফুটের একটা ৮০ ডিগ্রি ঢালু দেওয়াল পড়ল। এবারে দড়ির সাহায্যে নামতে হবে। মুশকিল হল যে আমাদের দড়িটার দৈর্ঘ্য মোটে ১৫০ ফুট। বাকিটা রোপ ছাড়াই নামতে হবে। কাণ্ড যেটা হল নামতে গিয়ে শেষরক্ষা হলনা, আমি পড়ে গেলাম। রাউতদার তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেও ডানহাতে বেশ ভালোমতোই চোট লাগল। তখন অবশ্য ব্যথাটা তেমন টের পাইনি। অবশেষে মাসার টপে পৌঁছে রাতের মতো থামা।
২০ জুন, ২০১১
সকালে টেন্টের বাইরে বেরিয়েই মনটা ভরে গেল - আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় দূরের পিকগুলোও ঝকঝক করছে। সেগুলো মোটামুটি আমাদের সমান উচ্চতায় হওয়ায় আমরা যে বেশ ওপরেই আছি সেটা বোঝা যাচ্ছে। প্রচণ্ড জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কিছুটা দূরে মাওয়ালি পাসের সেই রাস্তা, যেটা দিয়ে আমরা গতকাল এসেছি। একটু বাঁদিকে একটা বড় গ্লেসিয়ারের মধ্যে ধ্বসের চিহ্ন বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর অনেকটা নীচে প্রায় পুরোটাই জমে রয়েছে মাসার তাল। আমাদের পায়ের নীচ থেকে মাসার তাল পর্যন্ত একটা সোজা বরফের দেওয়াল নেমে গেছে প্রায় ৭০ ডিগ্রি ঢালে।

মাসার তাল

মাওয়ালি পাসের কাছাকাছি

আজ গাইডের পিছু পিছু সাবধানে চলা। কালকের সেই হাতের ব্যথাটা সকাল থেকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। মাসার তাল অবধি নেমে এসে বাঁদিকে মাসার তালকে রেখে এবার এগোনো ছোট মাসার তালের দিকে। মাঝে মাঝে কোথাও অনেকদিনপর একটুকরো সবুজ জমি চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে - এতদিনপরে কেমন জানি বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। মাঝে আরও তিনটে তুষার দেওয়াল পেরোলাম, তারমধ্যে দু'টো বেশ বিপজ্জনক। এই ঢালগুলি শেষ হয়েছে একেবারে ২০০০ ফুট নীচে নদীগর্ভে। প্রায় সারাদিন হেঁটে পৌঁছালাম চৌকি ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভিলাঙ্গনা নদী। নদীর ধারে সবুজ ঘাসের চাদর আর দূরে বরফ সাদা খাতলিং গ্লেসিয়ার আর খাতলিং পিক। পড়ন্ত বিকেলের রোদে চারদিক যেন মায়াময় হয়ে উঠছিল। এক কাপ কফি হাতে চুপ করে বসে সেই অসাধারণ সৌন্দর্য অনুভব করতে লাগলাম।

www.amaderchhuti.com

২১ জুন, ২০১১
যাত্রার প্রায় শুরুতেই ভিলাঙ্গনা নদীর ওপর সরু কাঠের ব্রীজ পেরোনো। এটা বোধহয় একইসাথে ধৈর্য্য, ব্যালেন্স আর ভয়কে জয় করবার পরীক্ষা। নীচে প্রবল স্রোতস্বিনী ভিলাঙ্গনার দিকে চোখ পড়লে বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। ব্রীজ পেরিয়ে নদীর বাঁদিক দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরলাম। ১৪ কিলোমিটার দূরে খারসোলি। মাঝে মাঝে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কতগুলো আইস-প্যাচ বা আইস-ব্রীজ। খারসোলি পৌঁছে নদীর ধারে ক্যাম্প ফেললাম।
২২ জুন, ২০১১
আজকের গন্তব্য গাঙ্গি। আজ থেকে টেন্টের পাট চুকলো। এবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরা। খারসোলি থেকে কল্যাণী বুগিয়াল পেরিয়ে একটা গ্রামে পা রাখতেই শুরু হল বৃষ্টি। ফাঁকা গ্রামে একটা ছোট বাড়িতে এক বৃদ্ধা ছাড়া কাউকেই আমরা দেখতে পেলামনা। তিনি প্রথমে সাহস করে আমাদের আশ্রয় দিতে রাজি হলেননা। পরে কাফ সিরাপ, গ্লুকন ডি ইত্যাদি উপহার দিয়ে অনেক কষ্টে তাঁর গোয়ালে আশ্রয় মিলল। কোনমতে একটা প্লাস্টিক পেতে সবাই মিলে ঘন্টাখানেকের মতো ঘুমিয়ে নিলাম। বৃষ্টি থামতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল। তারও একঘন্টা পরে পৌঁছালাম গাঙ্গি বাংলোয়। বেশ কয়েকদিন পর পরোটা আর আলু চচ্চড়ি খেয়ে পাকা ছাদের নিচে ঘুম দিলাম।

বরফের রাজ্যে - মাওয়ালি পাসে

২৩ জুন, ২০১১
আজ সকালে আমাদের ছোটার পালা, দু'দিনের পথ যাব একদিনে - গাঙ্গি থেকে রি হয়ে ঘুট্টু - ২০ কিলোমিটার। শেষ একঘন্টা খুব ভিজে প্রায় সন্ধ্যে ছ'টার সময় ঘুট্টুতে এসে পৌঁছালাম। আজ রাতের মেনুতে অনেকদিন পর রুটি-মাংস।
আমাদের পথ হাঁটার উপাখ্যান এখানেই শেষ। এরপর হরিদ্বার হয়ে কলকাতায় ফেরা।

~ মাওয়ালি পাস ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি ~

লক্ষ্যপূরণ

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সুদীপের শখ ট্রেকিং। বারুইপুরের ‘অনুভব নেচার লাভারস অ্যাসোসিয়েশন’ -এর সদস্য সুদীপ গত দশ বছরে সান্দাকফু-ফালুট, জোংরি-গোয়েচালা, গোমুখ-তপোবন-নন্দনবন, সিঙ্গালিলা প্রভৃতি নানান ট্রেকে অংশ নিয়েছেন।

Rate This : - select -
Total Votes : 16
Average : 3.25

Like 4 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

darun romanchokor . mone hayna may mase jaoa jabe bole. june ei je abostha dekhlam. tachhara apnader guide-porter ra khub ekta bhalo bole mone holona.

- Dipankar Roy [2012-09-14]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

জগদলপুরের জলপ্রপাতে

অদিতি ভট্টাচার্য

~ তথ্য- জগদলপুর ‖ জলপ্রপাতের আরো ছবি ~

বিশাখাপত্তনম থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম জগদলপুরের দিকে, উদ্দেশ্য ভরা বর্ষার শেষে তীরথগড় আর চিত্রকোট – ছত্তিশগড়ের এই দুই বিখ্যাত জলপ্রপাত চাক্ষুষ দেখা। বিশাখাপত্তনম থেকে জগদলপুরের দূরত্ব তিনশ পাঁচ কিলোমিটার। রাস্তায় পড়ে সবুজ গালিচায় মোড়া বেশ কয়েকটা সুন্দর সুন্দর ভ্যালি। এই সব দেখতে দেখতে অন্ধ্রপ্রদেশ পেরিয়ে, ওড়িষা পেরিয়ে, ছত্তিশগড়ে ঢুকে জগদলপুর পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল।
পরেরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লাম তীরথগড়ের উদ্দেশ্যে। তীরথগড় জলপ্রপাত জগদলপুর থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে। এই অরণ্যে ঢোকার মুখে পড়ছি সংগ্রহ করতে হয়। বিদেশী পর্যটকদের ক্ষেত্রে টাকাটা বেশি লাগে। কী অজ্ঞাত কারনে জানি না, যিনি পড়ছি দিচ্ছিলেন তিনি আমাদের বিদেশী পর্যটক ভেবে বসলেন। অবশেষে আইডেন্টিটি প্রুফ দেখিয়ে, বিশুদ্ধ হিন্দিতে বার্তালাপ চালিয়ে তাঁকে বোঝানো গেল যে আমরা নিখাদ ভারতীয়, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। আমাদের সঙ্গে এক দল অল্পবয়েসী ছেলে মেয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিল, বোধহয় কোনো কলেজ থেকে এসেছিল। তাদের হাসিঠাট্টায়, ব্যঙ্গবিদ্রুপে পড়ছি বাবুর অবস্থা তখন বেশ কাহিল। যাই হোক পড়ছি নিয়ে যাত্রা শুরু হল। দুপাশে ঘন জঙ্গল, অনেক জায়গাতেই রোদ্দুরের প্রবেশ নিষেধ। কানে আসছিল নাম না জানা কত পাখির ডাক। কত রকম চেনা অচেনা গাছ, বুনো ফুল, রঙ বেরঙের প্রজাপতির উড়ে বেড়ানো দেখতে দেখতে গা শিরশিরে হাওয়ায় এই যাত্রা সত্যিই এতো ভালো লেগেছিল যে বলার নয়।
বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর জলের গর্জন কানে এল। বুঝলাম কাছাকাছি এসে গেছি। গাড়ি এসে থামল অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গায় যেখানে জলের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। এতসুন্দর পরিবেশে বড় দৃষ্টিকটুভাবে লাগছিল চা, বিস্কুট, চিপস্, ঠাণ্ডা পানীয়র ছোট বড় একের পর এক দোকানগুলো। গাড়ি থেকে নেমে সেসব পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম রেলিং ঘেরা একটা ছোট ঝুলন্ত বারান্দার মত জায়গায়। আমাদের চোখের সামনে তখন নীল আকাশ আর সবুজ গাছপালার ব্যাকগ্রাউণ্ডে মুগাবাহার নদী ওপর থেকে নীচে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছিল পাহাড়ের গা দিয়ে ধবধবে সাদা চওড়া চওড়া ফিতে ঝোলানো রয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে নীচে নামতে শুরু করলাম যেখানে জলপ্রপাত মাটি স্পর্শ করেছে। শ' দুয়েক মত সিঁড়ি ভেঙে একদম নীচে পৌঁছনো যায়। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পা ডুবিয়ে ঘুরে বেড়াতে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয় কারণ পাথর অত্যন্ত পিচ্ছিল। বর্ষার ঠিক পরে হওয়ায় জলও খুব বেশি ছিল। পাহাড়ের একদম মাথায় শিব পার্বতীর প্রাচীন একটি মন্দির আছে। স্থানীয় মানুষকে সেখানে পুজো দিতে যেতে দেখলাম। আসতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু তাও কিছুক্ষণ পরে রওনা দিতে হল পরবর্তী গন্তব্য চিত্রকোট জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে।

চিত্রকোট জলপ্রপাত জগদলপুরের আটচল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত, তীরথগড়ের অপরদিকে। পৌঁছতে তাই বেশ সময় লেগেছিল। দুটো জলপ্রপাত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তীরথগড় জলপ্রপাত অনেক উঁচু থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গর্জনও বেশী। কিন্তু চিত্রকোট অত উঁচু নয়। ইন্দ্রাবতী নদী উনত্রিশ মিটার উচ্চতা থেকে নীচে নেমে এই জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে কিন্তু তার ব্যপ্তি অনেক বেশী। যেদিকে চোখ যায় শুধু জল আর জল। ইন্দ্রাবতী নদী তার বিশাল বিস্তার নিয়ে এখানে প্রবাহিত। জলপ্রপাতের সামনেই একটা রিসর্ট আছে কিন্তু তাছাড়া আর কোনো দোকান বা বাড়িঘর নেই। জলপ্রপাতের বাকী তিন দিক জঙ্গলে ঘেরা। যতদূর চোখ যায় শুধু গাছপালা আর জল। এখানেও কিছু কিছু জায়গায় পাথরের ওপর দিয়ে জলে পা ডুবিয়ে ঘোরা যায়।

www.amaderchhuti.com

যেখানে ইন্দ্রাবতী নদী সবচেয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখান থেকে জলকণা ধোঁয়ার মতো ওপর দিকে উঠেছে। শুনেছিলাম এখানে সূর্যের আলো পড়লে রামধনু দেখা যায়। কিন্তু সূর্য তখন মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। একটু মনখারাপ নিয়েই ফিরে আসছিলাম। হঠাৎই সূর্য বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে, দুপুরের চড়া রোদ্দুরে ঝলমল করে উঠল চারদিক। পেছনে তাকিয়ে দেখি জলপ্রপাতের গায়ে রামধনু। আকাশে রামধনু অনেকবার দেখেছি, বৃষ্টির পরে রোদ উঠলে, কিন্তু এত নীচে জলের ওপর রামধনু! কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর হুঁশ হতেই তাড়াতাড়ি এই অসাধারণ দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দী করা হল। ফেরার পথে জগদলপুরের ডোকরা শিল্পীদের হাতের কাজ দেখতে স্থানীয় বাজারে গেলাম। কিছুক্ষণ সেখানে ঘুরে আবার হোটেলে ফেরা। মনের মধ্যে রয়ে গেল দুই জলপ্রপাতের অপরূপ ছবি।

~ তথ্য- জগদলপুর ‖ জলপ্রপাতের আরো ছবি ~

তীরথগড় জলপ্রপাত

সংখ্যাতত্ত্ববিদ অদিতির কাছে বই আর অক্সিজেন সমতুল্য। কর্মসূত্রে বছর খানেক আরব দুনিয়ায় বসবাসের অভিজ্ঞতাও আছে। ছবি তোলা,এম্ব্রয়ডারির পাশাপাশি ভালোবাসেন বিভিন্ন জায়গায় বেড়িয়ে এসে ভ্রমণকাহিনি লিখতে।

চিত্রকোট জলপ্রপাত

Rate This : - select -
Total Votes : 13
Average : 3.15

Like 2 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

Post Comments

dhonyobad . ebar ekta idea paoa gelo.

- dipankar roy [2012-10-03]

Rasta beshir bhagtai pahari. Amra theme theme valley dekhte dekhte gechhilam. 7/8 hours to legei chillo jaoar samay (Bora/Aarku na dekhei). Tarpor depend kore rasta-r condition-r opor.

- Aditi Bhattacharyya [2012-10-02]

www.amaderchhuti.com

dhonyobad. kintu samay ta katota lage jante parlam na. mane rasta ta besirbhag samatl na pahari seta na janle to samay ta bojha jayna, bora cave ba araku na dekhe jodi jai, tahole 305 km er jonno katota samay lagte pare ?

- dipankar roy [2012-10-01]

Dhonyobad. Vizag theke Jagdalpur by road distance 305 km. Amra garitei gechhilam, jaoar pothe ba pherar pothe Aarku

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

রূপকুণ্ডের রূপের রহস্যে

দীপঙ্কর রায়

~ রূপকুণ্ডের ট্রেক রুট ম্যাপ ‖ ছবি - দীপঙ্কর রায় - সুব্রত দত্ত ~

কোন মহাপুরুষ যেন বলেছিলেন ভাল কাজের জন্য মিথ্যা বললে সেটা মিথ্যা হয়না! এবারে আমাদের রূপকুণ্ড ট্রেকিং-এর শুরুতে সেই কথাকেই আপ্তবাক্য করে আমি আর সোমনাথ বেরিয়ে পড়েছিলাম। সোমনাথ দে, কলকাতার বাসিন্দা আর আমার আন্তর্জালে খুঁজে পাওয়া ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু। ২ জুন আমি মহারাষ্ট্রের লাতুর থেকে আর সোমনাথ কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করি হরিদ্বারের উদ্দেশে। আমরা দুজনেই অফিসে ও বাড়িতে অর্ধসত্য বলি। আমি নিজের উন্নতির জন্য যোগ-ধ্যান শিবিরের কথা জানাই আর সোমনাথ আমার পরিবারের সঙ্গে হরিদ্বার-হৃষীকেশ-লছমনঝোলা ঘোরার কথা বলে। সোমনাথের কল্যাণে চিরকুমার আমি কিছুক্ষণের জন্য বৌ-বাচ্চার মালিক হয়ে যাই! এর আগে আমাদের সান্দাকফু-ফালুট ছাড়া অন্য বড় ট্রেকের অভিজ্ঞতা ছিলনা। তাই স্রেফ পাহাড়ে ওঠার নেশাকে সম্বল করেই বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে শুধু লোহারজঙের গাইড নরেন্দ্র সিং এর সঙ্গে দু-একবার ফোনে কথা হয়েছিল।

০৩/০৬/১২ – সোমনাথ আমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, আমি পৌঁছলাম রাত আটটার পর। ও স্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিল। একেবারে দাদা-বউদির হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে গেলাম।

০৪/০৬/১২ – ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে জি.এম. ও. ইউ. স্ট্যাণ্ড থেকে বাস ধরলাম। গন্তব্য লোহারজঙ। সরাসরি কোন বাস নেই, এমনকী কর্ণপ্রয়াগের বাসেও জায়গা না পেয়ে রুদ্রপ্রয়াগের বাসে উঠলাম। হৃষীকেশ – দেবপ্রয়াগ – শ্রীনগর হয়ে ছঘন্টা সময় লাগল রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছাতে। এখান থেকে বাসে কর্ণপ্রয়াগ। আরও কয়েকবার জীপ পালটে রাত নটায় লোহারজঙ পৌঁছাই নারায়নবাগার – থারালি – দেবল হয়ে। পিণ্ডার নদীর ধারে দেবল এখন বেশ জমজমাট। রাত হয়ে যাওয়ায় থারালি থেকে লোহারজঙ ভায়া দেবল দুবার জীপ রিজার্ভ করতে হল ৪০০/- আর ৮০০/- টাকায় । হরিদ্বার থেকে জীপ রিজার্ভ না করায় সস্তার তিন অবস্থার পনের ঘন্টার প্রাণান্তকর ধকল হজম করতে হল প্রায় ২৪০ কিমি রাস্তায়! প্রচণ্ড গরম আর ধোঁয়াশায় প্রয়াগ দৃষ্টিনন্দন লাগল না। গিয়ে দেখলাম নরেন্দ্রজী ইণ্ডিয়া হাইকসের লোকাল ম্যানেজার হয়ে কাজ করছেন। এঁরা নির্ঝঞ্ঝাটে রূপকুণ্ড ঘোরার ব্যবস্থা করে থাকেন।এঁদের আস্তানাতেই রাত কাটালাম। নরেন্দ্রজীর সঙ্গে আলোচনাও সেরে নিলাম। উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। ৮০০০ ফিট উচ্চতায় পৌঁছে হাল্কা ঠাণ্ডায় শরীরটা জুড়াল।

০৫/০৬/১২ – সক্কাল বেলায় গাইড নারায়ণ এসে ঘুম ভাঙাল। একটি ঘোড়া সহ পোর্টার গুড্ডুকে পাওয়া গেল।নারায়ণ রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে এল। স্থানীয় দোকান থেকে রসদ নেওয়া হল। কেরোসিনের অভাবে গমকল থেকে নেওয়া হল ডিজেল। লোহারজঙ-এ ট্রেকিং এর সবকিছুই কিনতে বা ভাড়ায় পাওয়া যায়। ওপরে টেন্ট পাওয়া যাবে তাই টেন্ট নেওয়া হয়নি। আলুপরটা আর চা খেয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে ১০ টা বেজে গেল।আজকের গন্তব্য দিদিনা, দূরত্ব প্রায় ৭ কিমি। অনেকেই অবশ্য গাড়িতে আরও এগিয়ে ওয়ান গিয়ে ট্রেক শুরু করেন।

প্রথমেই নামা। আমাদের রুকস্যাকও ঘোড়ার পিঠে। মনের আনন্দে খালি হাতে নাচতে নাচতে নামতে গিয়ে প্রথমেই বিপত্তি। আমার অতি বিশ্বস্ত হাঁটুযুগলের ডানদিকেরটি বিগড়ে গেল।আড়াই ঘন্টার উৎরাই পথ তখন প্রাণান্তকর লেগেছিল। যদিও রডোডেনড্রন-ওক-পাইনের জঙ্গলে ঘেরা পথটা বেশ সুন্দর। একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম আর নীলগঙ্গা নদী পার হয়ে এবার একটা প্রাণান্তকর চড়াই পথ। হালকা বৃষ্টিও শুরু হল। আমি প্রায় এক পায়েই উঠতে থাকলাম। পথে হাওড়ার চার যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। মোট পাঁচ ঘণ্টা ট্রেক করে বিকাল ৩ টা নাগাদ বৃষ্টিভেজা দিদিনায় পৌঁছলাম। ছবির মত সুন্দর মাটি-পাথরের দোতলা বাড়িতে উঠলাম। এটাই এখানকার থাকার ব্যবস্থা,হোম-স্টে। উচ্চতা ৮০০০ ফিট,তাই ঠাণ্ডাও হালকা। চা খেয়েই লেগে গেলাম এদের কাঠের উনুনে খিচুড়ি বানাতে, সাহায্যে নারায়ণ। হাওড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে সন্ধ্যাটা কাটল। রাতে আবার হেঁশেলে ঢুকে ডিমের ঝোল আর ভাত রান্না করলাম, সঙ্গে স্যালাড।

www.amaderchhuti.com

বেদিনী বুগিয়াল

০৬/০৬/১২ – গাইড-পোর্টারের রান্না করাতে বেশ অনীহা, তবুও সকালে তারাই খিচুড়ি বানাল। সোমনাথ ওর নীক্যাপ দিল, সেটা লাগিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম। আজও প্রায় ৯ টা বাজল বেরোতে। শুরুতেই শুকনো পাতায় বিছানো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কঠিন চড়াই। টোলাপানি হয়ে উঠলে চড়াইটা একটু সহজ হত। ঘণ্টা চারেকে পৌঁছলাম খুপাল টপ-এ। এখান থেকেই শুরু আলি বুগিয়ালের। বুগিয়ালের সবুজ গালিচায় বসে ছাতু মেখে খেলাম। আকাশ পরিস্কার থাকলে অনেক তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়। আরও ঘণ্টা দুয়েক হেঁটে দেখা পেলাম বিখ্যাত বেদিনী বুগিয়ালের। প্রায় ১২ কিমি পথ সাত ঘণ্টায় ট্রেক করে বেদিনী বুগিয়ালের ক্যাম্পে পৌঁছলাম বিকাল ৪টা নাগাদ। উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফিট। সোনালি রোদ, আকাশে ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি বিদ্যমান। অন্যদিকটা মেঘলা থাকায় এর বেশি পর্বতশৃঙ্গ দেখা গেলনা। এখানটায় ফরেস্টের পাঁচটি হাট আর একটা ঝুপড়ি, থাকা- খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও সেখানে ফোন করার সুবিধাও ছিল। ইণ্ডিয়া হাইকসের টেন্টেই আমাদের জায়গা হল। রোদে ঘাসের উপরে আরাম করে বসে মুড়ি-বাদাম খেতে শুরু করি, চাও এসে যায়। ইহা'র বিরাট একটা দল রূপকুণ্ড করতে ব্যর্থ হয়ে বেদিনী ফিরল। একটা হাট রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল, আমরাও সেখানে ডিমের ঝোল ভাত বানিয়ে নিলাম। ওদের ক্যাম্প ফায়ারেও যোগ দিলাম। বেশ ঠাণ্ডা। টেন্টের মধ্যেও বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। আমাদের স্লিপিং ব্যাগও বোধহয় বেশি উচ্চতার জন্য উপযুক্ত ছিলনা, হয়ত আমরা উচ্চতা ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও পাইনি।

০৭/০৭/১২ – সারারাত দুজনেরই ভাল ঘুম হয়নি। সকালটা মেঘলা। নারায়ণের কল্যাণে প্রাতরাশটা ওদের সঙ্গেই হয়ে গেল। যদিও পেটরোগা দুজনেই তেল চপচপে পুরী-সব্জি ভক্তি করে খেতে পারলাম না। আজ ৭ টা নাগাদ বেরলাম। হাওড়ার বন্ধুরা বেদিনীতেই থেকে গেল উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। বেদিনী কুণ্ডের পাশের ছোট্ট মন্দিরে পুজো দেওয়া হল। বর্ষার পর কুণ্ডে যখন জল থাকে তখন নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূলের অসাধারণ প্রতিফলন দেখা যায়। শুরুতেই দূরে পাহাড়ের খাঁজে যেখানে রাস্তাটা মিলিয়ে যেতে দেখা যায় সেটা ঘোড়ালোটানি। সামান্য চড়াই ভেঙ্গে সেখানে পৌঁছে গেলাম। এরপর সহজ লম্বা পথ পাথরনাচুনি পর্যন্ত। আমরা বিশ্রাম নিতে নিতেই এগোচ্ছিলাম। এক বিদেশি দম্পতি যেন পাখির মত উড়ে গেল আমাদের টপকে! পাথরনাচুনিতে ফরেস্ট হাট আছে, বেদিনীর মত একটা ঝুপড়িও আছে। এখান থেকে দেখা যায় সামনের পাহাড়ের মাথায় কলু বিনায়ক। কঠিন চড়াই। মনে আর হাঁটুতে জোর সঞ্চয় করে লড়াইটা শুরু করে দিলাম! মাঝপথে ছাতু খাবার অছিলায় বেশ খানিকটা বিশ্রাম। পথের ধারে বরফ পেতে থাকলাম। কলু বিনায়ক ছোট্ট একটা মন্দির। মেঘলা আবহাওয়া। আকাশ পরিস্কার থাকলে এখান থেকেও দারুণ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে একটা সহজ পথ গিয়েছে বাগুয়াবাসা ক্যাম্পে। মে মাসে যারা এসেছিল তাদের এখান থেকেই বরফ কেটে এগোতে হয়েছিল। আমরাও এই পথ মাঝেমধ্যেই বরফে ঢাকা পেলাম। প্রায় ৯ কিমি পথ ৯ ঘণ্টায় ট্রেক করে বিকাল ৪ টে নাগাদ পৌঁছলাম। বাগুয়াবাসার উচ্চতা প্রায় ১৪০০০ ফিট। আবহাওয়া মেঘলা, তবুও ঠাণ্ডাটা ভালই লাগছিল। ইণ্ডিয়া হাইকসের (ইহা) টেন্টেই জায়গা হল। ওদের স্লিপিং ব্যাগও পেলাম। এখানেও ফরেস্টের দুটি হাট আছে।এই সময় ইহা'র বিরাট দল রূপকুণ্ড করতে ব্যর্থ হয়ে খুব খারাপ অবস্থায় ফিরল। যেন কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে। তখনো আমরা দূরে দেখছিলাম আরও চারজন নামছিল। তাদের নামাটা দেখছিলাম। বড় দলটা ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেল বেদিনীর উদ্দেশে। বাকি

চারজন নামার পর দেখলাম দুজন ট্রেকার ব্যর্থ হয়ে বারবার বরফে আছাড় খেয়ে সম্পূর্ণ ভিজে শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে যেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এল এমন অবস্থা,বাকি দুজন গাইড। এরাও একটু পরে চলে গেল,জানিনা কী অবস্থা হয়েছিল তাদের! ক্যাম্পের পাশের বরফের ওপর আমি একটু অভ্যেস করে নিলাম! কিন্তু কিছুতেই সোমনাথকে বরফের উপর নিয়ে যেতে পারলাম না। অন্য এক গাইড ভুবনও তার দলকে বরফে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমাদের একপ্রস্থ আলোচনা হল। বিদেশিরা যাবেনা, আমরা দুই দলই যাব। সোমনাথ হাল ছেড়ে দিয়ে পরদিন আমাকে একাই যেতে বলল। আবহাওয়া আরও খারাপ হতে থাকল। আমরা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বাগুয়াবাসাতেও উচ্চকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করতে লাগলাম - কখনো 'একলা চল রে' বা কখনো 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি'। তাই শুনে বিদেশী পুরুষটি বাঁশি বাজিয়ে শোনাল। পরে জানলাম, ওঁরা দার্জিলিং প্রবাসী - হিন্দি,বাংলাও জানেন। আর ছিল নারী-পুরুষ মিলিয়ে দিল্লির ছ'জন। আমরা তিনটে আলাদা দল এক সঙ্গেই খেলাম। শেষমুহূর্তে সোমনাথও সাহস সঞ্চয় করে - যা হয় হবে দেখা যাবে - মনোভাব নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।পরদিন কাকভোরে যাত্রা শুরু হবে ঠিক হল।

বগুয়াবাসা থেকে রূপকুণ্ড

তুষারে ঢাকা রূপকুণ্ড

০৮/০৬/১২ - ভোর ৪ টেয় উঠে দেখি সারারাত তুষারপাত হয়েছে, যদিও আবহাওয়া ভালই মনে হল। আমি দুটো কাজ করলাম, নিজের পেটে জ্বালানি ভরে নিলাম, আর রাস্তার জন্যও বানিয়ে নিলাম। জুতোয় ইহা'র ক্রাম্পন লাগিয়ে ৫ টায় যাত্রা শুরু হল। গাইডদের কাছে বাকি সরঞ্জাম। আমরা দুজন, দিল্লির এক মহিলা সহ তিনজন আর ৪ জন গাইড মিলে মোট ন'জন। আজকের পুরো পথটাই প্রায় চড়াই আর বরফে ঢাকা,তাই বেশ কঠিন। মাসখানেক পরে বরফ গলে যাবার পর আবার ততটাই সহজ। তখন এই পথে ব্রহ্মকমল, হেমকমল ইত্যাদি অধিক উচ্চতার পাহাড়ি ফুল দেখতে পাওয়া যায়।ওদের গাইড ভুবন আগে থেকে পথ বানাচ্ছিল বরফ কেটে। আমরা ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলাম। শুরু থেকেই আমরা পিছিয়ে ছিলাম। উচ্চতা নিয়ে আমাদের মনে একটা ভয় ছিলই। এর আগে বরফের উপরে হাঁটলেও সেটা ছিল বিনোদন, আর এখানে মুহূর্তের ভুলে প্রাণসংশয়। মাঝপথে সোমনাথের আনা কোকা-৩০ একডোজ খেয়ে নিলাম দুজনেই।

ঠিক ৭-৩০ টায় আমরা প্রায় এক সঙ্গেই রূপকুণ্ডের মন্দিরে পৌঁছলাম। উচ্চতা প্রায় ১৬০০০ ফিট। নীচে চারদিকে বরফের ঢালে ঘেরা বরফাবৃত রূপকুণ্ড। সেই মুহূর্তের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সোমনাথ সাষ্টাঙ্গে মন্দিরের সামনের বরফে শুয়ে পড়ল। এখানেও পুজো দেওয়া হল। তারপর হঠাৎ এক গাইড মোবাইলে দারুণ একটা গাড়োয়ালী গান চালিয়ে দিয়ে নাচতে থাকল। আমিও তাতে যোগ দিলাম, এবং একে একে অন্যেরাও সেই স্বতস্ফূর্ত আবেগে ভেসে গেল। রূপকুণ্ড বা মিস্ট্রি লেকের গল্পটা গাইডই শোনাবে, আমি রহস্যই রেখে দিলাম! আমাদের সৌভাগ্য আবহাওয়া তখন দারুণ সুন্দর । আমরা ঠিক করলাম জোনারগলি পাসেও উঠব। সোমনাথ আর ওদের দলের মহিলাটি এক গাইডকে নিয়ে নেমে যাবে,বাকি ছ'জন উঠবো। স্বর্গের সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠতে শুরু করলাম। এক ঘণ্টায় পৌঁছেও গেলাম। উচ্চতা প্রায় ১৭০০০ ফিট। চারিদিকে ধবধবে সাদা বরফ, নীলাকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ।এ তো স্বর্গই! এমন জায়গায় পৌঁছনোর জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছজ্ঞান করা যায়। চোখের সামনেই নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূল। আর নীচে শৈলসমুদ্র পার করে এই দুই পর্বতের মধ্যে দিয়েই হোমকুণ্ড আর রন্টি স্যাডল যাবার পথ। সেখানে যেতে গেলে অগস্টে বা তার পরে আসতে হবে। আমার ছাতুমাখা আর ওদের আপেল ভাগ করে খাওয়া হল। এবার স্বর্গ থেকে মাটিতে নেমে আসার কঠিন বাস্তবতা! বরফের রাজ্য থেকে কর্কশ পাথুরে জমিতে ফিরে আসা। তবুও নামার সময়েও সাবধানের ত্রুটি ছিলনা। আমি অনেক দেরিতে সবার শেষে বাগুয়াবাসায় ফিরলাম ১০ কিমি পথ ৭ ঘণ্টায় হেঁটে, তখন বেলা ১২ টা। ফিরে দেখি হাওড়ার বন্ধুদের মধ্যে শুধু সৌম্যাশীষ হাজির,মানসিক ও শারীরিক ভাবে বিধ্বস্ত, বাকি তিনজন ওয়ান ফিরে গেছে। ওর তাঁবুতে বসেই আড্ডা মারতে লাগলাম। আমাদের পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। দিল্লির দলটাও চলে গেল। আমরা থেকে যাব ঠিক করলাম। আসলে ওই বরফের রাজ্য থেকে ফিরতে মন চাইছিলনা। শুরু হল প্রবল তুষারপাত। খিচুড়ির সঙ্গে তাঁবুর মধ্যে আমাদের আড্ডাও জমে উঠল। আলাপ হল ওর গাইড বিখ্যাত মোহন সিং বিস্ত-এর সঙ্গে। বাগুয়াবাসাতে আজ আমরা তিনজন মাত্র। রাত্রে ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচতে আমরা খালি হাটে গিয়ে ঢুকি তিনজনেই। সৌম্যাশীষ তার মোবাইলে অঞ্জন দত্তের 'বান্ধবী' নাটকটা শোনাল। অসাধারণ পরিবেশে অনবদ্য প্রেমের গল্প! পাহাড়কে যারা ভয়ডরহীন ভাবে ভালবাসে তাদের ভালবাসার খবর কেউ রাখেনা। অথচ জীবনে গভীর আঘাত না পেলে পাহাড়কে এইভাবে হৃদয় দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরা যায়না।

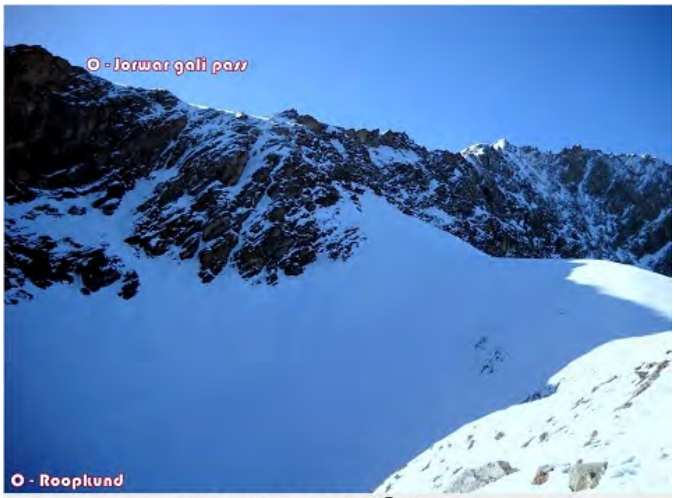

রূপকুণ্ড থেকে জোনার গলি পাস

০৯/০৬/১২ - এবার ফেরার পালা । সকালে সামান্য কিছু খেয়ে ৭ টায় বেরলাম বাগুয়াবাসা থেকে। একই পথে বেদিনী পৌঁছোতে দুপুর।বৃষ্টিও ভোগাচ্ছিল। তুষারপাতও শুরু হয়ে গেল। খিচুড়ি খাওয়া হল। আমরা ওয়ানের পথে রওনা দিলাম। কঠিন উৎরাই পথ, সেটাও আবার বৃষ্টিভেজা শুকনো পাতায় বিছানো। দুজনেই বারকয়েক পড়তে-পড়তে কিম্বা মরতে-মরতে বেঁচে গেলাম! ছোট্ট ফরেস্ট ক্যাম্প গাইরলি পাতাল পার করে,নীলগঙ্গা পার করে সামান্য চড়াই। দূর থেকে ওয়ান ফরেস্ট ক্যাম্প দেখে ভাবছিলাম পথ তাহলে ফুরাল, কিন্তু সেখান থেকেও গ্রাম অনেকটাই দূর। ২১ কিমি পথ প্রায় ১২ ঘণ্টা ট্রেক করে ৭টায় ওয়ান পৌঁছলাম। উচ্চতা ৮০০০ ফিট, এখানেও এক রাত কাটান যেত, কিন্তু আমরা নিরুপায়। এখান থেকে জীপ ভাড়াই করতে হবে, তাই ৮০০/- দিয়ে রাতেই লোহারজঙ পৌঁছে গেলাম। জিএমভিএন এ রাত কাটালাম। ইহা'র আস্তানা নতুন দলে ভর্তি।

১০/০৬/১২ - লোহারজঙ থেকে সকাল ৬-৩০ টায় দিল্লিগামী একটা বাস ছাড়ে। এটায় হলদোয়ানি যাওয়া যাবে। পরেরটা ৭-৩০ টায় কর্ণপ্রয়াগ। সময়ের গণ্ডগোলে আমরা সেটা পেলাম না। তবে শেয়ার জীপ পেলাম। দেবল থেকে ৯টায় প্রেসের জীপে কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে বেঁচে যাওয়া ছুটিতে আমাদের গন্তব্য দেওরিয়াতাল-চোপতা-তুঙ্গনাথ। সে অন্য গল্প।

~ রূপকুণ্ডের ট্রেক রুট ম্যাপ || ছবি - দীপঙ্কর রায় - সুব্রত দত্ত ~

www.amaderchhuti.com

জোনার গলি পাস থেকে দেখা

কলকাতায় বড় হলেও গত দশ বছর বাংলার বাইরে-বাইরেই কেটেছে দীপঙ্কর রায়ের। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের লাতুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের অ্যাকাউন্টস বিভাগের প্রধান দীপঙ্করের নেশা বেড়ানো। পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র বাদ পড়েনা কোনটাই।একবার বেড়িয়ে এসেই বসে পড়েন পরের বেড়ানোটা ছকে ফেলতে।বেড়ানোর পাশাপাশি কলম ধরার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

Rate This : - select -
Total Votes : 18
Average : 3.61

Like 29 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

dhonyobad abhishek. tomake pore kichhuta jodi sikhte pari lekhar kayda gulo. tabe tumi to janoi ghora tai amar kachhe mukhyo, lekha ta noy.

- Dipankar Roy [2012-09-14]

dipankar da, apni jotota kosto kore roopkunder pothe gechhilen thik tothota sohoj korei ami pore fellam apnar lekhati. besh sorol, bodhogomyotay durgom sthan ke bornona korechhen. beshhhhhhhhh bhalo laglo.... aro likhun....bhalo thakun... ar ei prithibitake bhalo rakhun...

- Avishek Chattopadhyay [2012-09-13]

sabaike dhonyobad lekhata porar jonno. jara jan ni, ekbar ghure asun. @ sabya....amar bhagner nam subrata roy, ekhane onno ekjon jini ei route e gechhilen tar chhobir album deoa achhe.

- Dipankar Roy [2012-09-13]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

=

মালয়েশিয়ার দুই প্রান্তে

রফিকুল ইসলাম সাগর

~ তথ্য- মালয়েশিয়া || ছবি - রফিকুল ইসলাম সাগর - সন্দীপ পাল ~

মেঘের রাজ্য গেন্টিং আইল্যান্ড

বাসটা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল যেন বিমান আকাশে উড়তে চলেছে। পথের দুপাশে সবুজ পাহাড়। পাহাড়কে বেড় দিয়ে উঠেছে গেন্টিং হাইল্যান্ড-এর পথ।

তিন বন্ধু মিলে গোম্বাক থেকে গেন্টিং যাচ্ছি - ছয় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর মালয়েশিয়ার গেন্টিং হাইল্যান্ড শহরকে মালয়েশিয়ার সব চেয়ে উঁচু জায়গা বলা যায়। কুয়ালালামপুর থেকে বেশ কাছেই। বাসে ভাড়া পড়ল মাথাপিছু ৯.৪০ রিঙ্গিত।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর গেন্টিং স্কাইওয়ের সামনে বাস থেকে নামলাম। কেবল্ কারে চড়তে হলে গেন্টিং স্কাইওয়ের সামনেই নামতে হবে। কেবল্ কারের টিকিট গোম্বাক থেকে বাসের টিকিট কেনার সময়েই একসঙ্গে হয়ে গিয়েছিল। একই টিকিট দিয়ে বাস ও কেবল্ কারে ওঠা যায়। কেবল্ কারে না উঠতে চাইলে অবশ্য সরাসরিও বাসে করে গেন্টিং হাইল্যান্ডে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে পুডু টার্মিনাল থেকে বাসে উঠতে হবে। কেবল্ কারে উঠার সময় দেখতে পেলাম অসংখ্য পর্যটকের ভিড়। রবিবার ছুটির দিন বলেই ভিড় আজ আরও বেশি। লাইন ধরে একটু একটু করে সামনের দিকে আগালাম। তারপর উঠে বসলাম কেবল্ কারের ভিতরে। কেবল্ কারে চড়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। নীচে মেঘে ঢাকা সবুজ পাহাড়, হাইরাইজ বিল্ডিংগুলো, ঝকঝকে রাস্তাঘাট ভারি সুন্দর লাগছিল। গেন্টিং হাইল্যান্ড এর আগেও একবার গিয়েছি কিন্তু তখন যাওয়ার সময় কেবল্ কারে চড়া হয়নি। ফিরে আসার সময় কেবল্ কারে করে নিচে নেমেছিলাম। অবশেষে পৌঁছালাম গেন্টিং হাইল্যান্ডের একেবারে মাথায়, ছয় হাজার ফুট উঁচুতে।

শহরে পৌঁছানোর সাথে সাথেই প্রচণ্ড শীত অনুভব করলাম। হাতে থাকা শীতের কাপড়টি গায়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর পর মেঘ এসে ঘিরে ফেলছে আমাদের, ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। প্রচণ্ড বাতাস যেন ঘুড়ির মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। মেঘে ঢাকা পড়ে বড় বড় বিল্ডিংগুলো। চারিদিকের সবুজ পাহাড়গুলো আমাদের থেকে নীচে। পাহাড়ের এক পাশে ঘন কালো মেঘের অন্ধকার। দূরে দেখা যায় রোদের রেখা। রোদের মাঝেই হঠাৎ বৃষ্টি। এ যেন এক মেঘের রাজ্য। মনে হচ্ছে যেন আকাশের উপর বসে থেকে আমরা দেশটাকে দেখছি।

দুপুরের খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম গেন্টিং দর্শনে। মালয়েশিয়ার অন্যান্য জায়গার চেয়ে গেন্টিং হাইল্যান্ডে খাবারের দাম অনেক বেশি। সাইন বোর্ডের দিক নির্দেশনা দেখে প্রথমে পৌঁছে গেলাম গেন্টিং থিমপার্কে। এখানে রোলার কোস্টার সহ নানা ধরনের রাইড রয়েছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন রাইডে চড়লাম। থিম পার্কে ঢোকার জন্য জনপ্রতি ৫০ রিঙ্গিত মূল্যের টিকিট লাগে। এই টিকিটেই সব রাইডে ওঠা যায়।

www.amaderchhuti.com

তবে গেন্টিং হাইল্যান্ডের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ক্যাসিনো। এই শহরটি জুয়াড়িদের কাছে খুবই পরিচিত। বিশ্বের অনেক দেশ থেকে জুয়াড়িরা এখানে জুয়া খেলতে আসেন। গেন্টিং হাইল্যান্ড গেলে দেখা যায় বিশ্বের সব দামী দামী গাড়ি, মালয়েশিয়ার অন্য কোথাও কিন্তু এই গাড়িগুলো সব সময় দেখা যায় না। ক্যাসিনো ক্লাবে সবাই প্রবেশ করতে পারে এবং জুয়া খেলতে পারে। তবে অবশ্যই বৈধ পাসপোর্ট থাকতে হবে। ক্লাবের ভিতরে ছবি তোলা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করার সময়েই সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে কাউন্টারে জমা রেখে যেতে হয়। ক্লাবে প্রবেশের জন্য অবশ্য কোনো খরচ গুনতে হয়না। আমরা কেউ ক্যাসিনো খেলতে পারি না। ক্যাসিনো ক্লাবের ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্যদের খেলা দেখছিলাম। কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না। ক্যাসিনোতে প্রতিদিন রিঙ্গিতের বিকল্প প্লাস্টিক কাউন্টার দিয়ে কোটি কোটি রিঙ্গিতের জুয়া খেলা হয়। জেতার পর ক্যাশিয়ারের কাছে কাউন্টার নিয়ে গেলেই ওইগুলোর বিনিময়ে সমমূল্যের রিঙ্গিত পাওয়া যায়।

এখানে আরেক মজাদার আকর্ষণ ভূতের আড্ডা। মানুষ ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে।এছাড়া পর্যটক আকর্ষণের জন্য সারাবছরই চলছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় আবার কেবল্ কারে চড়ে বাস টার্মিনালের সামনে আসলাম। ফিরে আসার সময় বাসে বসে দূর থেকে দেখতে পেলাম আলোক সজ্জায় সজ্জিত গেন্টিং হাইল্যান্ড। দিনের বেলার মেঘে ঢাকা চেনা শহরটাকে রাতের আঁধারে যেন মনে হচ্ছে আলোয় মোড়া অচেনা এক দেশ।

নীল-সবুজের লাংকাউই

কেবল কার থেকে দেখা গেন্টিং হাইল্যাণ্ড

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা লাংকাউই দ্বীপ ও সেখানকার সমুদ্র সৈকত যেন কোনো এক শিল্পীর তুলিতে আঁকা সুনিপুণ চিত্রকর্ম। যতবার এর সান্নিধ্যে এসেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি আর প্রশংসা করেছি সেই স্রষ্টার যিনি এত যত্ন নিয়ে সৃষ্টি করেছেন।তিনদিনের হঠাৎ এক ছুটিতে আমরা পাঁচবন্ধু - মিলন,বাদশা,তুহিন, ওয়াসিম আর আমি আবারও বেরিয়ে পড়েছিলাম সেই অপরূপ প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের আশায়।

রাত ১২ টায় পুডু বাস টার্মিনাল থেকে আমাদের দোতলা বাসটি যাত্রা শুরু করল কুয়ালা পারলিস ফেরি ঘাটের উদ্দেশে।ভাড়া মাথাপিছু ৪৭ রিঙ্গিত। ইউরো ২০১২ ফুটবল ম্যাচের খেলা উপভোগ করছিলাম টিভির পর্দায়। মধ্যরাতের নীরবতাকে আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের বাসটি। নিজের অজান্তেই মন হারিয়ে যাচ্ছিল ফেলে আসা কোনো হৃদয়-নিংড়ানো স্মৃতি রোমন্থনে। প্রায় তিন ঘন্টা পর বাসটি দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে আরও অনেক পথ বাকি। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক - কেমন মায়াবী হয়ে উঠেছে। চুপ করে বসে আপনমনে তাই যেন অনুভব করছিলাম। কুড়ি মিনিটের বিরতির পর আবার বাস চলতে শুরু করল।

বাস চলেছে তার আপন গতিতে। গভীর রাত, ক্লান্ত শরীর আর এসির শীতল হাওয়া। এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুমালাম না। কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার সময় আমার ঘুম হয়না। বাসের ভেতরটা এখন নীরব।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে চারদিকটা আলোকিত হয়ে উঠছে। উঁচু-নিচু পাহাড় আর সবুজে ঘেরা বনভূমির মধ্য দিয়ে আঁকাবাকা পথ। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় সুন্দর প্রকৃতি যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য অসম্ভব রকমের শিহরণ জাগায় মনে।

গেন্টিং হাইল্যাণ্ডে

অবশেষে প্রায় নয় ঘন্টা পর আমরা কুয়ালা পারলিস ফেরি ঘাটে পৌঁছলাম। লাংকাউই দ্বীপে যেতে এখান থেকেই লঞ্চে উঠতে হবে। জন প্রতি ১৮ রিঙ্গিত দিয়ে লঞ্চের টিকিট কিনে নিলাম। লঞ্চ ছাড়তে আরও বিশ মিনিট বাকি। এরমধ্যে নাস্তা খেয়ে নিলাম। লঞ্চে উঠে সিট নাম্বার মিলিয়ে দেখি আমাদের সবার সিট এক সঙ্গে পাইনি। আমাদের তিনজনের পাশে অন্য যে দুইজন বসেছেন তাঁদের অনুরোধ করলাম আমাদের এক সাথে বসতে দেওয়ার জন্য। ওঁরা রাজি হলে আমরা পাঁচ জন এক সঙ্গে বসলাম। ছাড়ার পর কিছুটা গিয়ে হঠাৎ লঞ্চের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম। সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে লঞ্চটি। ঢেউয়ের সাথে সাথে দুলছে। খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। বার বার বাহির হওয়ার দরজাগুলো গুনছি আর লাইফ জ্যাকেটের দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু না, একটু পরে লঞ্চ আবার চলতে শুরু করল, আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। ইঞ্জিনে সামান্য সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণে এমন হয়েছে। মোবাইলে একটি মেসেজ পেলাম। আমরা থাইল্যান্ড এর সীমান্তের কাছে রয়েছি। মেসেজটি ছিল যদি থাইল্যান্ড এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে চাই তাহলে কী করতে হবে। এক ঘন্টা বিশ মিনিট পর লাংকাউই দ্বীপে গিয়ে পৌছলাম। এমনিতে পৌঁছাতে মিনিট পঞ্চাশ সময় লাগে। ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় প্রায় আধঘন্টা বেশি লেগেছে।

লাংকাউই-এর পথে

www.amaderchhuti.com

লাংকাউইতে ঘোরার জন্য যে কোনো রকমের গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আপনি যে কয়দিনের জন্য গাড়ি ভাড়া নিবেন ততদিন গাড়ি আপনার তত্ত্বাবধানে থাকবে। কিন্তু অবশ্যই আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এবং গাড়ি আপনাকে নিজেই চালাতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স যে কোনো দেশের হলেই চলবে। দিন প্রতি ৩০ রিঙ্গিত দিয়ে এক-একটি মোটর সাইকেল ভাড়া নিলাম। গাড়ি ভাড়া করে ঘুরলে নিজের ইচ্ছা মতো ঘোরা যায় এবং মালয়েশিয়ায় তেলের দাম কম (পেট্রল ১.৯০ রিঙ্গিত লিটার) বলে খরচও কম হয়। মোটর সাইকেল নিয়ে রওনা হলাম পান্তাই চেনাং বিচের উদ্দেশে। কার আগে কে যাবে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সবাই আগেও এসেছি তাই চেনা পথ। পান্তাই চেনাং পৌঁছানোর পর হোটেলে রুম ভাড়া করলাম দিন প্রতি ৮০ রিঙ্গিত দিয়ে। রুমে সব কিছু রেখে আর দেরি করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্র স্নানের উদ্দেশে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ সৈকতে পর্যটক বেশ কম। দূরে একটি লাল পতাকা দেখতে পেলাম। এবার বুঝলাম পর্যটক কম কেন। বিপদ সংকেত চলছে তাই। যখন পাঁচমূর্তি একসাথে তখন কোনকিছুই কি আর বাধা হতে পারে? ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রের বুকে। তবে সবাইকে বলেছিলাম সতর্ক থাকতে, খুব বেশি দুরে যেন কেউ না যায়। সমুদ্রের সান্নিধ্যে এসে বাঁধভাঙা আনন্দে মুহূর্তের মধ্যে সবাই যেন বদলে গেলাম। বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরাও যেন সমান তালে উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়ছি বারবার। লবণাক্ত পানি মুখে যাচ্ছে, তাতে কী যায় আসে, প্রাণের উচ্ছ্বাস বলে কথা! ঘন্টা দুয়েক পরে অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমুদ্র থেকে উঠে আসতে হলো। লাঞ্চের পর রুমে আসলাম একটু বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে। ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পরেছিলাম সবাই। জেগে উঠে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সমুদ্র সৈকতে বালিতে খানিক খালি পায়ে হাঁটলাম। তারপর একেবারে রাতের খাবার খেয়ে লাংকাউই বিমান বন্দরের পাশে গিয়ে বসলাম। একটির পর একটি বিমান নামছে রানওয়েতে। চুপ করে বসে এই দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। হোটেলে ফিরে এসে সবাই মিলে আড্ডায় বসলাম। কার্ড খেলতে খেলতেই ভোর হয়ে গেল।

সকালে ঠিক হলো আজ সারাদিন ঘুরে একেবারে সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরব। বেরিয়েছিলাম কেবলকারে চড়ব বলে। পথে দেখতে পেলাম একটা হেলিকপ্টার। ভাবলাম এতেই আগে চড়ে নিই। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম হেলিকপ্টারে চড়তে তিন জনের খরচ হবে ৪০০ রিঙ্গিত। আমরা রাজি হলাম। আট মিনিটের জন্য হেলিকপ্টারে চড়েছিলাম।সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা - আকাশ থেকে সমুদ্র আর ছোট ছোট সবুজ দ্বীপগুলিকে দেখা। তবে লাংকাউইর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ কেবলকার। মূল গেটের সামনে মোটর সাইকেল পার্কিং করলাম। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলে পুরোটাই মার্কেট। জনপ্রতি ৩০ রিঙ্গিত দিয়ে টিকিট কেনা হলো। এবার ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছি আমরা। যেতে যেতে দেখতে পেলাম একদিকে উঁচু পাহাড় আর অন্যদিকে বিস্তৃত সমুদ্রের উজাড় আলিঙ্গনের ছবি। অবশেষে ৭০০ মিটার উঁচুতে গিয়ে কেবলকার থেকে নামলাম। সেখানে স্কাই ব্রিজে পর্যটকদের ভিড়। স্কাই ব্রিজ থেকে সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ্য। আশে পাশে বিশাল উঁচু উঁচু পাহাড় আর সমুদ্র। যেদিকে চোখ যায় শুধুই সবুজ আর সমুদ্রনীল। দূরে দেখা যায় ছোট বড় জাহাজ - একে একে চলে যাচ্ছে আপন গতিতে। ২০০৪ সালে চালু হয়েছে স্কাই ব্রিজ। তার পর থেকেই লাংকাউইতে পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখ্যভাবে বাড়তে থাকে। স্কাই ব্রিজ থেকে অসংখ্য নিসর্গদৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করলাম। আরেকটি কেবলকারে করে নীচে নামলাম।

লাংকাউই স্কাই ব্রীজ

এরপর প্রায় ১০ কিলোমিটার দুরে একটি পাহাড়ি ঝরনা দেখতে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ করার সময় গেটের সামনে প্রচুর বন্য বানর দেখলাম। বানরগুলো খুব হিংস্র। বেশ সতর্কতা নিয়েই ভিতরে প্রবেশ করলাম। আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে অনেকটা পথ উঠতে হলো। লক্ষ্য করলাম পাহাড় থেকে ঝরনার পানি নীচে গড়িয়ে পড়ার গতি খুবই কম। সেই ক্ষীণ জলধারাতেই অনেক দর্শনার্থী মনের আনন্দে গা ভিজাচ্ছেন।

পান্তাই চেনাং সৈকত

ঝরনা থেকে বেড়িয়ে এবার অনির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটে চলছি আমরা। মাইলের পর মাইল। মোটর সাইকেলের স্পীডোমিটারের কাঁটা ১৫০ ছুঁই ছুঁই। ফাঁকা রাস্তা। ছবির মতো সব দৃশ্য। পথের পাশে দৃষ্টিজুড়ে নীলাভ বিস্তীর্ণ সমুদ্র জলরাশি। মাথার ওপর সুবিশাল আকাশ, কখনো কখনো দুপাশেই বিশাল পাহাড়ের সমাহার। পাহাড়ের মাঝে মাঝে গভীর খাদগুলোর দিকে তাকালে গা শিউরে ওঠে। তবু আল্লার কী অপূর্ব সৃষ্টি এই প্রকৃতি!

এরই মধ্যে বিকেল হয়ে এল। পথের এক প্রান্তে সমুদ্রের পাশে একটা খাবার হোটেলে থামলাম। ঘোরার আনন্দে দুপুরের খাবার খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। খাবার পেতে একটু দেরি হল। সি-ফুডের রান্না হতে সাধারণত দেরিই হয়। খেয়ে নিয়ে আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এই বিচের সঙ্গে পান্তাই চেনাং বিচের মূল পার্থক্য হলো এখানে বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য পাথর আর প্রবালের উপস্থিতি। পাথরগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেন সমুদ্রের গলায় মুক্তার মালা জড়ানো। এরই মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো - পশ্চিম আকাশ রঙিন হয়ে উঠেছে। বেশ উৎসবমুখর পরিবেশ। সবাই সূর্য ডোবা দেখার অপেক্ষায়। পাথরের ওপর বসে সমুদ্রের গায়ে পা রাখতেই একচিলতে ঢেউ এসে ধুইয়ে দিয়ে গেল। যেন সমুদ্র সাম্রাজ্যে আগত বিশেষ কোনো অতিথি বরণ করে নেওয়া হল। ক্রমশ ঢেউ-এর তেজ বাড়ছে - সমুদ্র যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আগুনে ঝলসানো একটি লাল থালা ক্রমশঃ পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। সূর্যাস্ত দেখছিলাম একমনে - হঠাৎ খেয়াল পড়ল চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। আমাদেরও ফিরতে হবে এবার।

পরদিন সকালে নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম কেনা-কাটার উদ্দেশে। এখানে অনেক ডিউটি ফ্রি সপ আছে -এই দোকান গুলোতে খুব কম দামে নানান জিনিস পাওয়া যায়। লাংকাউইতে খাবারের দামও কম। টুকিটাকি শপিং করে হোটেলে ফিরে এলাম আমরা। দুপুর দুইটায় রুম ছাড়তে হবে। আজ আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা। লাংকাউই ফেরি ঘাটে এসে মোটর সাইকেলের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে কুয়ালালামপুরের দিকে রওনা দিলাম। ভাবতে ভালোই লাগছিল প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে হয়তো নিজেকে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করতে পেরেছি।

প্রকৃতি অবশ্য মানুষের থেকে অনেক বেশি উদার আর নিরহঙ্কারী।

~ তথ্য- মালয়েশিয়া || ছবি - রফিকুল ইসলাম সাগর - সন্দীপ পাল ~

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ফাউন্ডেশন কোর্সে পাঠরত রফিকুলের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়। পড়াশোনার পাশাপাশি বেড়ানো আর ভ্রমণ সাংবাদিকতা তার পছন্দের বিষয়।

www.amaderchhuti.com

Rate This : - select -
Total Votes : 31
Average : 4.16

Like 13 people like this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

Post Comments

"প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে আমার প্রেম। ছবিগুলি দেখে খুবই মুগ্ধ হোলাম। SHARE করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

- PUSHPA [2012-11-23]

KI SUNDAR LEKHA & CHABI.

- Preet khan [2012-11-23]

ছবিগুলো অনেক অনেক খন ধরে আজ দেখলাম। আমি সবসময় ভ্রমন লেখার অপেক্ষায় থাকি। চমৎকার।

- মিজান [2012-11-20]

Thanks Rafikul for ur nice writing and photography.

- Jony Ahmed [2012-11-19]

নৈসর্গিক নায়াগ্রা

পায়েল চক্রবর্ত্তী

~ তথ্য- নায়াগ্রা জলপ্রপাত || - নায়াগ্রার আরো ছবি ~

সময়টা জুলাই মাস। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চার দিনের টানা ছুটিটা কাটানোর জন্য উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নায়াগ্রাতে আগে থেকেই আমরা রির্সট বুক করে রেখেছিলাম।
বাস ধরার জন্য ভোর ছ'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে গেলাম এডিসন-এ। বাসে উঠে জানলার ধারে বসেই দীর্ঘ ন'ঘন্টার পথ কতক্ষণে শেষ হবে তা একবার ঘড়ি দেখে হিসেব করে নিলাম। মাঝে ক্যাফেতে একটু থেমে বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা।
স্বামী-র কর্মসূত্রে আমরা নিউ জার্সি-র বাসিন্দা। যখন ছোটবেলায় ভূগোলের বই তে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ছবি দেখেছিলাম, বিশদ বিবরণ পড়েছিলাম তখন কখনও ভাবিনি যে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাতকে চাক্ষুষ দেখারও সুযোগ পাব! নায়াগ্রা আমেরিকার নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে এবং কানাডার অন্টারিও প্রদেশের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

www.amaderchhuti.com

একটা ব্রিজ পেরোনোর সময় গাইড ভিকি জানালেন যে আমরা নায়াগ্রা নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি,আর কিছুক্ষনের মধ্যেই জলপ্রপাতের সামনে পৌঁছে যাব। বাসশুদ্ধ সবাইতো দারুণ উত্তেজিত। বাস থেকে নেমে নায়াগ্রা ফলস্ স্টেট পার্কের মধ্যে দিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম নায়াগ্রা নদীর জলও কুলুকুলু শব্দে বেগে এগিয়ে চলেছে, তারপর যেন হঠাৎই আমাদের মুগ্ধ করে ১৬৭ ফুট গভীর খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। চারপাশে প্রচুর মানুষের ভিড়। নায়াগ্রাতে এই সময় প্রায় কুড়ি লাখ মানুষের সমাগম ঘটে। রেলিং-এর ধার ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জলপ্রপাতের একদম সামনে। ঝোড়ো হাওয়াতে জলের ছিটে এসে লাগছে চোখেমুখে। না! এ তো আর বই এর পাতার ভিতরের ছবি নয়,এ যে পুরো সামনে দাঁড়িয়ে! স্পর্শ পাচ্ছি শরীরে!

আমরা সামনে যে জলপ্রপাতটিকে দেখছিলাম তার নাম আমেরিকান ফলস্। আসলে চারটি হ্রদের জলের ধারা মিলিতভাবে তিনটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে - আমেরিকান ফলস্, ব্রাইডাল ফলস্ এবং হর্সস্যু ফলস্ বা কানাডিয়ান ফলস্। এই তিনটি জলপ্রপাতকে একসাথে নায়াগ্রা ফলস্ বলা হয়। গাইডকে অনুসরণ করে রওনা হলাম এরপর মেইড্ অফ্ দ্য মিস্ট -এ যাওয়ার জন্য।

লিফটে নামলাম পাঁচতলা থেকে একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে। সেখানে রেনবো ব্রীজের কাছে ফেরিঘাট থেকে একটা ফেরিতে উঠে জলপ্রপাতের একদম মাঝখানে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু হল আমাদের। একটা নীল রেনকোট দেওয়া হল। বাঁদিকে আমেরিকান ফলস্ এবং ব্রাইডাল ফলস্-কে ফেলে এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে - আশপাশ ঢেকে আছে ধোঁয়ার মত সূক্ষ্ম জলকণায়। যত এগোচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল যেন কুয়াশার চাদর কেটে কোন আজব দেশে চলেছি!

অনেক উঁচু থেকে প্রচণ্ড বেগে জলের ধারা যেখানে আছড়ে পড়ছে তার থেকে মাত্র হাত কয়েক আগে বোটটা দাঁড়িয়ে পড়ল। চারপাশে জলপ্রপাতের মাঝে কিছুক্ষণের জন্য যেন বাকি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া! প্রায় ২২০১ ফুট চওড়া জলপ্রপাতটি যেন দুহাত মেলে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে তার গর্জনের সুরে। চোখের সামনে যে নৈসর্গিক রূপ আমরা দেখছিলাম, সৃষ্টিকে সত্যি তার জন্য ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। ঘোড়ার ক্ষুরের মত আকারের এই জলপ্রপাতের নাম হর্সস্যু ফলস্। এখানেই রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। বোটের বাঁদিকে চেয়ে দেখি কাছ ঘেঁষে একটা রামধনু যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার ফন্দি আঁটছে। ওপর থেকে সূর্যও যেন যোগ দিয়েছে সেই খেলায়। তারই মাঝে মাঝে সীগাল পাখিগুলি জলপ্রপাতের কাছ ঘেঁষে খেলার ছলে তাদের স্নান সেরে নিচ্ছে, সঙ্গে চলছে মাছ শিকার। বাতাসে ভেসে বেড়ানো জলকণা পবনদেবের দৌরাত্মে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের শরীর-মন।

এত বিভোর হয়ে ছিলাম যে হঠাৎ সামনের একটি ঘটনায় সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখলাম জলপ্রবাহের সামনে একটা গোল বড় রাবার বল ওপর থেকে পড়ল আর তৎক্ষনাৎ দুটি পুলিশ হেলিকপ্টার আবির্ভূত হয়ে আমাদের বোটের সামনের দিকে চক্কর খেতে থাকল বলটি উদ্ধার করার জন্য। আমাদের বোটের ডানদিকে অন্য একটি বোটে মানুষের হর্ষধ্বনি, উড়ন্ত নিশানা দেখে বুঝলাম ওটি কানাডার বোট। ফেরিঘাটে ফেরার সময় গাইডকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এটা সম্ভবতঃ কোনও কীর্তিমানের বাহাদুরিতার নিদর্শন -এই ইভেন্টের নাম 'নায়াগ্রা ডেয়ার ডেভিল'। রাবারবলের ভিতর বসে কোনও অতি সাহসী ভদ্রলোক জলপ্রপাতের ওপর থেকে প্রায় ২০০ ফুট নিচে ঝাঁপ দিয়ে হয়তো জয় করলেন ভয়ঙ্কর সুন্দর এই নায়াগ্রাকে। এরূপ চেষ্টা আগেও বহুবার হয়েছে। জীবিত থাকলে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, আর অসফল হলে সুইসাইড রেকর্ড!

ফেরি ছাড়াও পায়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামনে থেকে নায়াগ্রাকে দেখার আর এক উপায় আছে যার নাম 'কেভ অফ দ্য উইন্ডস'। ব্রাইডাল ফলস্ এর পিছনের

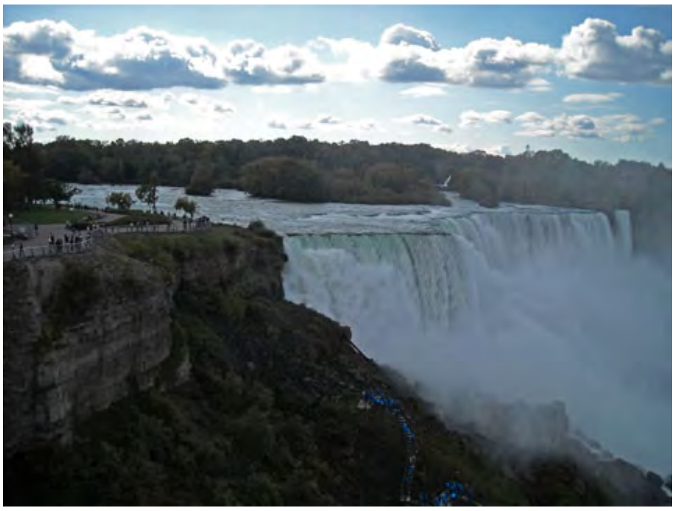

দিকের গুহা কেটে তার উপর দিয়ে সিঁড়ি বানিয়ে ফলস্-এর সামনে দিকে এনে একটা ডেক এর মত জায়গার উপর দাঁড়িয়ে ফলসটাকে সামনের থেকে দেখার আর তার সাথে কালবৈশাখী ঝড়ের মত জলপ্রপাত এর দমকা বাতাস অনুভব করা এক দারুণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু কিছু মেরামতির কাজ চলছিল বলে সেই সৌভাগ্য আমাদের হল না।

সূর্য ঢলে পড়ছিল পশ্চিমে - দুই দেশের সীমান্ত থেকে পড়া নানা বর্ণের আলোর ছটায় নায়াগ্রাকে যেন আরও মোহময়ী লাগছিল। ক্রমশঃ রাত নেমে এল। পূর্ণিমার দু'দিন আগের পূর্ণ চাঁদের মায়ায় বর্ণময় জলপ্রপাতের ঝঙ্কারে আমার মন যেন কোন অপার্থিব দুনিয়ায় পৌঁছে দিল।

www.amaderchhuti.com

~ তথ্য- নায়াগ্রা জলপ্রপাত || - নায়াগ্রার আরো ছবি ~

হাওড়ার মেয়ে পায়েল স্বামীর কর্মসূত্রে আমেরিকা প্রবাসী। ভালোবাসেন গান শুনতে, নানারকম রান্না করতে আর নানান নতুন জায়গায় বেড়িয়ে এসে সেইসব অভিজ্ঞতার কথা লিখতে।

Rate This : - select -
Total Votes : 10
Average : 3.50

Like One person likes this. Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

Post Comments

Nicely written.

- Partha Chattopadhyay [2012-09-11]

ছুটির আড্ডা

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই কিন্তু এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - amaderchhuti@gmail.com

কলকাতার কাছেই

প্রত্যূষ সেনগুপ্ত

‖ তথ্য - অম্বিকা-কালনা ~ ছবি - অম্বিকা-কালনা ‖

ডিসেম্বরের ছুটির দিনের সকাল। কুয়াশার চাদর সরিয়ে আকাশে ঝলমলিয়ে রোদ উঠতে না উঠতেই ক্যামেরা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। হাওড়া থেকে ঠিক সকাল দশটার কাটোয়া লোকালে রওনা দিলাম ৮২ কিলোমিটার দূরের অম্বিকা কালনা। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বর্ধমান জেলার মহকুমা সদর কালনা হয়তো খুব একটা পরিচিত দ্রষ্টব্য স্থান নয়, তবে এই শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে গড়ে ওঠা অজস্র টেরাকোটার মন্দির।সেইসব মন্দিরের কারুকার্যের ছবি তোলার ইচ্ছেতেই আমার এই কালনা ভ্রমণ।

ট্রেন ব্যান্ডেল ছাড়ার পর কাটোয়া লাইনে ঢুকতেই আস্তে আস্তে চারিদিকের পরিবেশ বদলে যেতে শুরু করল। জানলা দিয়ে যতদূর চোখ যায় চারদিকে বিভিন্ন মরসুমি ফসলের সমারোহ। ফলন্ত শাকসব্জির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে অচেনা জায়গা ঘুরে দেখার জন্য একটি সাইকেল-রিক্সা ঠিক করে মিনিট পনেরোর মধ্যে এসে পড়লাম মন্দির চত্বরে। একই এলাকায় এখানে রাস্তার দুপাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির।

প্রথমেই একশো আট শিবমন্দির। ১৮০৯ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর। মন্দিরগুলি দুটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার সারিতে বিন্যস্ত। বাইরের সারিতে রয়েছে ৭৪ টি এবং ভেতরের সারিতে ৩৪ টি শিবলিঙ্গ। দুটি বৃত্তের মাঝখানে সাজানো বাগান আর বাঁধানো রাস্তা পুরো জায়গাটিকে এক অদ্ভুত সুন্দর রূপ দিয়েছে। বিভিন্ন কোণ থেকে এই বৃত্তাকার গঠনশৈলীর ছবি তুলতে তুলতে মোহিত হয়ে গেলাম। ঠিক বিপরীতে বিশাল চত্বরে একের পর এক মন্দির। ঊনবিংশ শতকের রেখদেউলের আদলে গড়ে ওঠা প্রতাপেশ্বর মন্দিরের চার দেওয়াল জুড়ে জমকালো টেরাকোটার নিখুঁত শিল্প এককথায় অসাধারণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি তোলার সময় লক্ষ্য করলাম সে যুগের শিল্পীরা মূলতঃ তাঁদের সমকালীন সমাজচিত্র এবং আরাধ্য দেবদেবীর মূর্তি এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতাপেশ্বর মন্দির থেকে একটু এগিয়ে রাসমঞ্চ। খোলাছাদের এই সুবিশাল মঞ্চটির লাগোয়া এই এলাকার প্রাচীনতম পঞ্চবিংশতিরত্ন (২৫ টি চূড়া সম্বলিত) লালজী মন্দির।১৭৩৯ সালে তৈরী এই প্রাসাদোপম স্থাপত্যের সামনে প্রশস্ত চাতালে রয়েছে চারচালা নাটমন্ডপ এবং গুহাকৃতি গিরিগোবর্দ্ধন মন্দির।পঞ্চবিশতিরত্নের আরও একটি নিদর্শন কৃষ্ণচন্দ্রজী মন্দির।১৭৫১-৫৫ তে নির্মিত এই ত্রিখিলান (৩ টি দরজা বিশিষ্ট) দেউলের বারান্দায় টেরাকোটার কাজগুলি বিশালাকৃতি ফলকের উপর গড়া। লালজী ও কৃষ্ণচন্দ্রজী মন্দিরের মাঝে একই সারিতে পাঁচটি ভিন্ন আকারের শিবমন্দির নিয়ে পঞ্চরত্নশিব মন্দির।

www.amaderchhuti.com

রিক্সা করে এগিয়ে চললাম আমলীতলা হয়ে ভাদুড়ীপাড়া। আমলীতলায় প্রকান্ড তেঁতুলগাছের নীচে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণযুগলের স্পষ্টচিহ্নকে ঘিরে একটি ছোট মন্দির রয়েছে। ভাদুড়ীপাড়ার পঞ্চবিশতিরত্ন গোপালজী মন্দির দেখে অবশেষে পৌঁছলাম অতিপ্রাচীন শ্রী শ্রী অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরে। চোদ্দটি অর্ধচন্দ্রাকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গর্ভগৃহে বামাকালীর অধিষ্ঠান। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে এখানে জমজমাট পরিবেশ।দেবীদর্শন করার পর ফেরার পালা। তিনঘন্টার সফর শেষে বিকেল ৩ ৩০ এর ডাউন কাটোয়া লোকাল ধরতে আবার স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম।

এতদিন ভেবেছি টেরাকোটার উৎকর্ষে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের শিল্পকর্মের বুঝি কোনো জুড়ি নেই, কিন্তু আজ অবশ্যই বলতে পারি সৌন্দর্য্ ও সূক্ষতার মাপকাঠিতে অম্বিকা কালনা বিষ্ণুপুরের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা এই মন্দিরগুলিকে সঠিকভাবে প্রচার ও পরিচিতির আলোয় আনতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে এই শহরটিও এক জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করবে॥

আই.বি.এম.-এ কর্মরত সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যূষ ভালোবাসেন বেড়াতে আর ক্যামেরায় ধরে রাখতে সেইসব মুহূর্তগুলো।

Rate This : - select -
Total Votes : 24
Average : 3.54
Like 11 people like this. Sign Up to see what your friends like.
tell a Friend

ছোট্ট ছুটির পুরী

জয়ব্রত মুখার্জি

|| তথ্য - পুরী ~ পুরীর আরো ছবি ||

সপ্তাহের মাঝে দু'দিন ছুটি পেয়ে আমবাঙালির চিরপ্রিয় পুরী যাওয়াই ঠিক করলাম। পুরীর এটাই মজা যে বারবার গেলেও কখনো পুরনো হয়না। পুরী এক্সপ্রেসে ভোরবেলায় পৌঁছে সোজা হোটেল ভিক্টোরিয়ায়।

জগন্নাথের মন্দিরের সঙ্গে কেমন একটা প্রাচীন শব্দ -গন্ধ জড়িয়ে আছে। শুধু ভিড় আর পাণ্ডাদের উৎপাতটাই খুব বিরক্তিকর। মন্দিরের ভেতরের ভাস্কর্যও অতুলনীয়। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতেই অনেক সময় লেগে গেল। শোনা যায়, সূর্যবংশীয় রাজা অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পেয়ে সমুদ্র থেকে পাওয়া কাঠ দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিটি ও পরে মন্দিরটি তৈরি করান। মন্দিরের বেদিতে বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রার মূর্তির সঙ্গে রয়েছে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নীলমাধবের মূর্তিও। তবে বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণকাজ অনেক পরে রাজা অনন্তবর্মন শুরু করলেও তাঁর পৌত্র রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের আমলে শেষ হয়।

www.amaderchhuti.com

মন্দির থেকে ফিরে শুধু সমুদ্র। পুরীতে সমুদ্রের ধারেই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরে স্নানপর্ব সেরে হোটেলে খেয়ে এসে আবার সাগরে ফেরা। দুপুর-বিকেল কাটানো বালুকাবেলায়।

পরদিন একটা গাড়ি ভাড়া করে ঘুরতে বেরোলাম। হোটেল থেকেই সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। আমাদের গন্তব্য ধৌলাগিরি, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি আর কোণারক। ভুবনেশ্বর থেকে কোণারকের পথে পুরী রোডে ধৌলিচক থেকে ডানদিকে আরও কিছুটা দূরে ধৌলি বা ধৌলাগিরি। এখানেই ঐতিহাসিক কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল কলিঙ্গরাজ ও সম্রাট অশোকের মধ্যে। যুদ্ধজয়ের পর অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে অনুতপ্ত হয়ে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ধৌলিতে অশোক পাহাড়ের গায়ে খোদিত রয়েছে রাজা অশোকের কাহিনি।এখানে একটি শায়িত বুদ্ধমূর্তি আছে। পাহাড়ের ওপর থেকে ভুবনেশ্বর শহরের দৃশ্যও খুবই সুন্দর।

পূর্বঘাট পর্বতমালার এপারে খণ্ডগিরি, ওপারে উদয়গিরি। পাহাড় কুঁদে তৈরি হয়েছিল এই গুহাগুলি। উদয়গিরিকে বৌদ্ধদের গুহাও বলা হয়। উদয়গিরিতে মোট ৪৪টি গুহা আছে। গুহাগুলি দেখতে দেখতেই পৌঁছে যাওয়া যাবে খণ্ডগিরিতে। খণ্ডগিরি জৈন তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। এখানে ১৯টি গুহা আছে। উদয়গিরি - খণ্ডগিরির অনেকগুলো গুহাতেই অপরূপ ভাস্কর্য মুগ্ধ করে। সবকটি গুহা দেখতে অনেক সময় লেগে যায়।আমরা ১৫০ টাকা দিয়ে একজন গাইডকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। এতে বেশ সুবিধেই হয়েছিল।

দুপুরের খাওয়া সেরে পৌঁছালাম কোণারকে। ওড়িশার মন্দির ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিঃসন্দেহে কোণারকের সূর্যমন্দির। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাতেও রয়েছে এর নাম। মন্দিরটি ঠিক কবে তৈরি হয়েছিল আর কেইবা করেছিলেন তা নিয়ে নানান কাহিনি আছে। তবে রাজা নরসিংহদেব ১৩ শতকে বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণ করেন।মোট ২৪টা চাকা এবং ১৪টি ঘোড়ার মূর্তি দিয়ে রথের আকারে তৈরি এই মন্দিরটি ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও কারুশিল্পের একটি অনবদ্য নিদর্শন। মন্দির জুড়ে নর্তকী, নর-নারীর মিলন দৃশ্য, বাজনা-বাদক, যুদ্ধ - একের পর এক অপরূপ ভাস্কর্য বারবার দেখেও পুরোনো হয়না।

কোণারকের কাছেই চন্দ্রভাগা সৈকতে অপরূপ এক সূর্যাস্ত দেখে পুরীর হোটেলে ফিরে এলাম - রাতেই ঘরে ফেরার ট্রেন ধরা - ফিরে যাওয়া আবার রোজের ধরাবাঁধা রুটিন জীবনে।

ফটোগ্রাফিটাই জয়ব্রত-র নেশা, ভালোবাসেন বেড়াতেও। চাকরি আর দৈনন্দিন জীবন থেকে সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন ক্যামেরা হাতে।